# গয়া-তীর্থ

ও

# বরাবর পাহাড়।

৺কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত।

১৯২২।

# নিবেদন।

অসুস্থ অবস্থায় 'গয়া-তীর্থ' শেষ করিয়া কলম রাখিয়া মাতুল মহাশয় বলিলেন,—'আমার লেখা শেষ হইল।' তখন কেহ ভাবে নাই যে এই লেখাই তাঁহার জীবনের শেষ লেখা, ইহার দ্বিতীয় দিবসে, ১৬ই মাঘ, ১৩২৬, তাহার জীবনেরও শেষ হইল।

"বরাবর পাহাড়" তাহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গয়া হইতে তিনি 'বরাবর' দেখিতে গিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধও এখানে সন্নিবেশিত হইল।

তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, গয়া কার্য্য করিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। গয়ায় শ্রাদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ কাজ, যেন ইহার জন্যই তিনি জীবিত ছিলেন। যেদিন তাহার গয়ার কার্য্য শেষ হইল, তিনি স্বস্তি নিশ্বাসে বলিলেন 'আঃ, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন মরিলেও দুঃখ নাই। সত্যই যে মৃত্যু তাঁহার এত নিকটে ছিল তাহা জানিতাম না। এই 'গয়া তীর্থ' আবার তাঁহার মৃত্যু শয্যায় লেখা -কারণ ইহা শেষ করিয়া তিনি কয়েক ঘণ্টা সজ্ঞানে ছিলেন। এইজন্য তাহার এই প্রবন্ধ তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে বিশেষ আদরের। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ইহার প্রকাশ করিলাম।

৯৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৫ই বৈশাখ, ১৩২৯।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
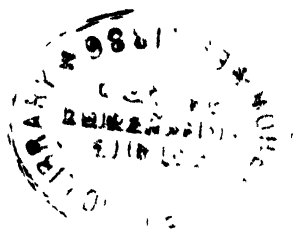
# গয়া-তীর্থ।

বন্ধুবর্গ আমার নাম রাখিয়াছেন "অজাগর কুঁড়ে," বিশেষণটা অসঙ্গত বলা যায় না। নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া কতকগুলি অভ্যাসের বশ হইয়া পড়িয়াছি—এই যেমন ঘণ্টা তুই ধরিয়া স্নান—তাহার জন্ত বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে কোথাও যাওয়া, ইদানীং আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে বন্ধু বান্ধবেরা দূরে কোন স্থানে বেড়াইতে যাইবার কল্পনা করিয়া আমাকে সঙ্গে লইবার উদ্যোগ করিয়াছেন, বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত ঠিক করা হইয়াছে, প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে আমার মত বদলাইয়া গিয়াছে, বলিয়াছি এবার থাক, পরে দেখা যাইবে। এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। বেড়াইতে যাইবার প্রসঙ্গ উঠিলেই একটি বন্ধু প্রায়ই বলেন তোমার মটো "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি," আমি ঈষৎ হাসিয়াই মতটার উত্তর দিয়াছি। ইদানীং শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ডাক্তার বাবু তাড়া দিতেছেন—বাহিরে কোথাও দিন কতক হাওয়া খাইয়া আসা একান্ত আবশ্যক, আত্মীয় স্বজনকে উস্‌কাইয়া দিতেছেন, ভয় দেখাইতেছেন, এমন কি ধমক দিতে পর্য্যন্ত ছাড়িতেছেন না, কিন্তু তবু এ অজাগর কুঁড়েকে নড়াইতে পারেন নাই। এ আমার নিজের সম্বন্ধীয় কথা, পরকে শুনাইবার দরকার কি? দরকার আছে বলিয়াই আত্মচরিত পাড়িয়াছি।

ইংরাজী পড়িয়া হউক, সাহেবের সংস্রবে আসিয়াই হউক, কালের স্বধর্ম্মেই হউক, যে কারণেই হউক, আমাদের হিন্দুয়ানী কমিয়া আসিয়াছে, অস্বীকার করা চলে না। তীর্থ—তরাইবার স্থান আমরা বড় মানি-টানি না। 'সনাতন ধর্ম্ম' বলিয়া চীৎকারই করি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মিটিংএই যাই, আমাদের বাপঠাকুরদাদা হিঁদুয়ানী বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহার সহিত সম্পর্ক আমাদের অন্তর্দ্ধান-বিন্দুতে পৌঁছিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাঁক করিবার জন্য কথাটা পাড়ি নাই, আমাদের শিক্ষিত (অল্প শিক্ষিত) সমাজে হাওয়াই দাঁড়াইয়াছে এই প্রকার। কেন জানি না, মনে হইল, নিজে মানি আর না মানি, গয়ায় পিণ্ডটা দিয়া আসি। শরীর ভাঙ্গিতেছে, পরে আর হইয়া উঠিবে কি না উঠিবে এই বেলা কাজটা সারিয়া আসি। রামায়ণে, মহাভারতে, স্মৃতিতে, পুরাণে, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইয়াছি 'এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ। তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ॥' লোকে বহু পুত্রের কামনা করিবে, গুণবান পুত্রের কামনা করিবে, কারণ, তাহাদর মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়ায় যাইতে পারে, গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিতে পারে। বাপ মার পুত্রগণের মধ্যে কাহারও দ্বারা হয় নাই, গুণবান হই না হই আমি ইচ্ছা করিলে এ কাজ করিয়া ফেলিতে পারি। প্রায় মাসাবধিকাল কেবল মনে হইতেছিল, নিজে মানি আর না মানি, বাপ মা ত মানিতেন, তাহাদের জন্য এ কাজটা করিয়া আসি। আগেকার কালে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা বেশী ছিল তাহারা হয়ত স্বপ্ন পাইত, প্রত্যাদেশ মনে করিত। আমাদের মত অভক্তজনের সে সব হয় না। তবে, মনে একটা আগ্রহ আসিয়াছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

আমার একটী ভাগিনেয়ের গয়ায় বাড়ী আছে, তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিলাম গয়ায় যাইব। তিনি পূর্ব্বে কতবার আমায় সাধ্যসাধনা করিয়াছেন তাহার সে বাড়ীতে যাইবার জন্য, আমি কথা রাখি নাই। এবার আমার

মুখে প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমে ত তিনি বিশ্বাসই করিলেন না যে আমার পক্ষে ইহা সম্ভব; পরে যখন বুঝিতে পারিলেন রহস্য নহে, তখন তিনি আগ্রহে বলিলেন, 'বেশ এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি, আমার বাড়ী উপস্থিত খালি নাই, ভাড়া দেওয়া আছে; কিন্তু তা হউক গয়ায় আমার পরিচিত ভদ্রলোক অনেক আছেন, আমি আজই পত্র লিখিতেছি, পত্রই বা কেন---বিলম্ব হইবে। এখনই তার করিতেছি; আপনি প্রস্তুত হউন, কোনও অসুবিধা হইবে না।' আমি বলিলাম, 'শুধু বন্দোবস্ত করিয়া দিলে চলিবে না, সঙ্গে যাইতে হইবে, যে কয়দিন সেখানে থাকিব, দেখা শুনা না করিলে, অপরিচিত লোক একা যাইয়া আমি কাহার দ্বারস্থ হইব? কাহার অনুগ্রহ ভিখারী হইতে গিয়া অপ্রস্তুতে পড়িব?' ভাগিনেয় যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান, তৎক্ষণাৎ তাহাতেই সম্মত হইলেন।

দুইদিন পরে আসিয়া জানাইলেন, বাড়ী ঠিক হইয়াছে, এক বন্ধুর বাড়ী, কোন ভাবনা চিন্তা নাই, চলুন। মনে স্থির করিয়াছিলাম, কষ্টে-সৃষ্টে কোন গতিকে ত্রি-রাত্রি বাসকরতঃ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পলাইয়া আসিব। বাপ মার নিমিত্ত না হয় একটু কষ্ট স্বীকার করাই গেল। দিন স্থির হইল, কাপড়-চোপড় গুছাইতে, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইতে লাগিলাম। যে দিন যাত্রা করিবার কথা, তাহার আগের দিন ভাগিনেয়টি আসিয়া মুখ চূণ করিয়া জানাইলেন, কাল যাওয়া স্থগিদ থাক, দিন চার পাঁচ পরে যাওয়া হইবে। কারণ? এই মাত্র গয়া হইতে Wire আসিয়াছে Post-pone coming house engaged যেহেতু নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে অকস্মাৎ একটি সম্ভ্রান্ত লোক সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি গয়া করিতে আসিয়াছেন, তিন চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া দিবেন। আমি ত শুনিয়া কিছু ভাবিত হইলাম—এই যা বাধা পড়িল! আমার নিকটে একটী বন্ধু বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'আপনি মন ফিরাইবেন না, আমি

বাড়ী ঠিক করিয়া দিতেছি, অমুক বন্ধুর গয়ায় বাড়ী রহিয়াছে বোধ হয় সমগ্র গয়ার মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ বাড়ী, সেইখানে থাকিবেন; আমি সন্ধ্যার সময় চিঠি আনাইয়া দিব।' তাহাই হইল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নামে চিঠি আসিল, আমাদের আর কোন ভাবনা রহিল না। এখন কোন্ ট্রেণে যাওয়া যায়, কোন্ ট্রেণে গেলে সব চেয়ে সুবিধা বা সব চেয়ে কম অসুবিধা তাই লইয়া তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল, সন্ধ্যার সময় খাইয়া-দাইয়া পাঞ্জাব মেলে যাওয়া হইবে। সাড়ে আটটায় ট্রেণ, রাত্রি সাড়ে তিনটায়, কিউল জংসনে পৌঁছাইয়া দিবে; সেখান হইতে সাউথ বেহার রেল পথ দিয়া বেলা ৯টার সময় গয়ায় পৌঁছান যাইবে।

ভাগ্যে আগে হইতে বার্থ রিজার্ভ করা ছিল! ষ্টেসনে আসিয়া দেখি বিষম ভিড়। আপনজন যাঁহারা ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা গাড়িতে বসাইয়া উপদেশ দিলেন, বিছানা পাড়িয়া একদিককার গদি সমস্ত একেবারে দখল করিয়া বসুন; খবরদার ইহাতে আর কাহারও স্থান দিবেন না, ট্রেণে ভদ্রতা দেখাইতে গেলে নিজেকেই পস্তাইতে হয়। ঘুমাইবার ইচ্ছা হইলে সুবিধা পাইবেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কচি খোকাটির মত আমি উপদেশাবলী শুনিয়া গেলাম, কোন উচ্চ বাচ্য করি নাই। ভাগিনেয় বাবু সঙ্গে যাইতেছেন, আর একটি আত্মীয় গয়া বেড়াইয়া আসিবার জন্য সঙ্গে যাইতেছিলেন তাঁহাকেও লওয়া গেল, ভালই হইল। আমরা তিন জনে তিন নীচেকার গদিতে বিছানা পাড়িয়া, আসনগুলি দখল করিয়া বসিলাম। ট্রেণ ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে আর দুইটি ভদ্রলোক, ইহাদের উপরকার বার্থ দুটি রিজার্ভ করা ছিল, আমাদের কামরায় আমাদের বিছানা পাতা দেখিয়া একটু এদিক-ওদিক করিতে লাগিলেন, আমরা কি ধরণের লোক জানা নাই, আমাদের বিছানার উপর বসিতে সাহস করিতেছিলেন না। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাঁহাদিগকে

ডাকিয়া আমার বিছানায় বসাইলাম, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ট্রেণ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ষ্টেসনের কোন তক্‌মা লওয়া কর্ম্মচারী আর একটি ভদ্রলোককে আমাদের কামরায় উঠাইয়া দিলেন, বলিয়া গেলেন যদিও সব বার্থ আপনাদের রিজার্ভ একটিমাত্র ভদ্রলোককে স্থান দিতে আশা করি আপনাদের অমত হইবে না। জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। সে ভদ্রলোকটী নিতান্ত সঙ্কোচিতভাবে জড়সড় হইয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম।

কথায় কথায় বাহির হইয়া পড়িল তাঁর ইণ্টার ক্লাসের টিকিট, কোন গাড়িতে স্থান নাই বলিয়া তিনি আমাদের কামরায় আশ্রয় লইয়াছেন; যাইবেন পাটনায়, কিন্তু বর্দ্ধমানে এ কামরা হইতে নামিয়া পড়িবেন। দেখিলাম লোকটি অতি ভাল মানুষ, বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জিত হইতেছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়া গল্প জুড়িয়া দিলাম। একজন আসিতেছেন মান্দ্রাজ হইতে, সটান চলিয়াছেন আলাহাবাদে—লম্বা পাড়ী। অপরটি কলিকাতার কোন ব্যবসায়ী, যাইতেছেন মৃজাপুর, আপন জন্মস্থানে। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বেশ গল্প-সল্পে আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া গেল দেখিলাম ভাগিনেয়টি ঘন ঘন ঘড়ী খুলিতেছেন, আত্মীয়টির সঙ্গে ফিস্ ফাস্ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছা নয় যে রাতটা শিবরাত্রি করিয়া কাটাই। তাঁহাদের মন রাখিতে বালিস্ ঠেস দিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিলাম। সহযাত্রিরা দেখিলেন আর বড় সুবিধা হইবে না, অগত্যা তাঁহারা উভয়ে উপরের দুই ব্যঙ্কে স্বস্থানে আরোহণ করিলেন। আমি ঘুমাই নাই, যদি ঘুম আসে এই মতলবে গল্প-সল্প বন্ধ করিয়াছিলাম; অভ্যাস নাই, চলন্ত ট্রেণে ঘুম আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমার আত্মীয় দুটি আমাদের কথোপকথনে কিঞ্চিৎ যোগ দিয়াছিলেন

তাঁহারা লাজুকের শিরোমণি, বেশী আলাপ-সালাপে আদৌ প্রস্তুত নহেন। পথিমধ্যে বর্দ্ধমানে যখন ট্রেণ থামিয়াছিল গাড়িতে বসিয়াই মিঠাইয়ের ঠেলা গাড়ি হইতে কিছু মিহিদানা, সীতাভোগ সংগ্রহ করিয়া লইলাম। পরের ষ্টেসনে 'হিন্দু চা' ডাক শুনিয়া নূতন কি সামগ্রী ভাবিয়া তাহাই এক পেয়ালা আস্বাদন করিয়া লইলাম। মন্দ নয় আজকাল রেল পথে যাতায়াতে হিন্দুয়ানী বজায় রাখা চলে, দেখিতেছি। মুসলমানের রুটি-কাবাব হিন্দুর মাছি ভরা মিঠাই, চা ষ্টেসনে ষ্টেসনে ফিরি হয়, গাড়িতে বসিয়া পাওয়া যায়।

মেল ট্রেন অধিক সংখ্যক ষ্টেসনে থামে না! বর্দ্ধমানের পর আসান-সোল, মধুপুর, ঝাঝা তাহার পর রাত সাড়ে তিনটার সময় কিউল জংসন। আমরা হাওড়া হইতে জানিয়া লইয়াছিলাম, আমাদের গয়ার টিকিট, ইচ্ছা হইলে আমরা কিউলেও নামিতে পারি কিম্বা বাঁকিপুর হইয়াও যাইতে পারি। কিউল ষ্টেসনে যখন পৌছান গেল, আমাদের ট্রেণ হতে দেখা যাইতে লাগিল, দূরে সাইডিংএ গয়াগামী ট্রেণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ডাকাডাকি করিয়া কুলি মিলিল না। শেষ রাত! আমার সঙ্গীদের দৃষ্টি প্রখর, তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন, ও গাড়িতে বেজায় ভিড়। অতএব সাব্যস্ত হইল, আমরা এখানে নামিব না বাঁকিপুরে নামিব। বাঁকিপুরে ট্রেণ পৌঁছাইবে ভোর ছয়টায়। সেই ভাল। আবার সব শুইয়া পড়া গেল। আমাদের ট্রেণ মোকামা হইয়া ক্রমে বাঁকিপুরের জংসনে আসিয়া থামিল; তখন ঊষা-বধূ বেশ করিয়া ঘোমটা খুলিয়াছেন। আমরা ক্ষণ-পরিচিত বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, মাল পত্র লইয়া অবতরণ করিলাম। এখান হইতে পাটনা-গয়া লাইন আলাহিদা। প্লাটফর্ম্মের অপর দিকে ট্রেণ দাঁড়াইয়াছিল, আমরা গিয়া একখান সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর দরজা খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কতদিন যে এ গাড়ির দরজা জানালা

খোলা হয় নাই তাহার ইয়ত্তা নাই; কামবার মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ হইয়া গিয়াছে, গদি টদি সব ধূলায় ধূলা। বেল কোম্পানীর উচিত, সদাসর্ব্বদা আরোহী না জুটিলেও উচ্চশ্রেণীর কামরাগুলিতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বাখেন। আমাদেব সঙ্গে চাকব ছিল, জানালা গুলা তুলিয়া দিয়া ধূলা ঝাড়িতে বলিয়া আমবা প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়াইতে আসিলাম। জলের কল ছিল মুখ হাত ধুইয়া লওয়াও চলিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পবে এই ট্রেণ ছাড়ে। ঘট্ ঘট্ করিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল, পথে আমবা একটি ছোট পোল পার হইলাম, নিম্নে বিস্তৃত চর ভূমিব মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণকায়া তটিনী অতিশয় আকিয়া-বাঁকিয়া ধীব গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। শুনিলাম নদীব নাম পুন্‌পুন্--পবিত্র সলিলা স্রোতস্বিনী, পূর্ব্বে নাকি গয়াযাত্রিবা এই পুন্‌পুন্ জলে স্নান কবিয়া শুদ্ধ হইয়া তবে গয়ায় পিণ্ড দান করিতে যাইত, এখনও অনেকে তাহা কবিয়া থাকে। আমাদের সে শুদ্ধিলাভের অবসর হইল না। এখানে একটি ষ্টেসন আছে ট্রেণ থামে, পুন্‌পুন্ ষ্টেসন। হিন্দুগণেব কর্ত্তব্য বেল কোম্পানীকে অনুবোধ করিয়া এমন বন্দবস্ত করা, যাহাতে এই ষ্টেসনে ট্রেণ অন্ততঃ কোয়াটাব খানেক অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অনেক গয়াতীর্থ যাত্রী এখানে নামিয়া পুনপুন সলীল স্পর্শ করিবার অবসর পাইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বেল কোম্পানীব মেল ট্রেণেব অত দ্রুত গতি অনুভব কবিয়া আসাব পব, এ লাইনেব এই ট্রেণেব গতি অতি ঢিমে মনে হইতে লাগিল—জ্বালাতন বোধ হইল। কিন্তু পথেব দুই ধারেই শস্যশ্যামল প্রান্তরবাজি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। গয়া জিলায় এবাব বেশ ফসল হইয়াছে ধান্য ক্ষেত্রই অধিক। ক্রমে নয় দশটি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া মন্থর গতিতে হেলিতে দুলিতে বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টাব সময় গয়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। গয়া এখন বেশ বড় ষ্টেসন।

হাওড়া ষ্টেসনে আমাদের বিছানার বস্তা ও একটা বড় ট্রাঙ্ক বৃহদাকার জিনিষ বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানী আমাদের কামরার সঙ্গে লইতে দেয় নাই Gya লেবেল মারিয়া লগেজ ভ্যানে পাঠাইয়া ছিলেন, অবশ্য আলাহিদা মাশুল লাগে নাই—ওজনে বেহাই ছিল। গয়া ষ্টেসনে আসিয়া খবর লইয়া দেখিলাম আমাদের সে মাল পূর্ব্বেই আসিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কিউল পথে আমাদের আগে পৌঁছিয়াছে। ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া গাড়ী ঠিক করিবার উদ্যোগ করা যাইতেছে, দেখিলাম ভিন্ন ভিন্ন গয়ালী ঠাকুরদের অনুচরবৃন্দ গাড়ী ঘেরওয়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা আপন আপন প্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক বড় করিয়া পরিচয় দিয়া, থাকিবার কত কি সুবিধা জানাইয়া, আমাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সঙ্গীদ্বয় বুঝাইয়া দিলেন তাঁহারা তীর্থ করিতে আসেন নাই, তবে পরিত্রাণ পাওয়া গেল। আমি মৌন রহিলাম! সত্যের অপলাপ হয় নাই। যে বাসায় যাইতে হইবে তাহা বলিবা মাত্র গাড়োয়ান বুঝিয়া লইল, গয়ায় সে বাড়ী ছোট বড় সকলেরই সুপরিচিত।

আমরা যখন নির্দ্দিষ্ট আবাসে পৌঁছিলাম তখন বেলা ১০॥-১১টা হইবে। উত্তমরূপেই অভ্যর্থিত হইলাম। পরদিন অমাবস্যা, ঐদিন আমি শ্রাদ্ধাদি মনস্থ করিয়াছি, সুতরাং এ দিন সংযম। বাজার হইতে আতপ চাউল, ঘৃত উপকরণ, আনাজ-কোনাজ ফল-মূল আনিতে লোক পাঠান হইল; আত্মীয়দ্বয় বলিলেন, তাঁহারাও সখ করিয়া আমার সঙ্গে হবিষ্যান্ন উপভোগ করিবেন। বেশ। ইতিমধ্যে আমরা স্নান সারিয়া লইলাম। কলের জল দেখিয়া প্রাণ তর হইয়া গেল। আমার বিষম ভাবনা ছিল, বিদেশে-বিভূঁয়ে কলিকাতার মত জল পাইব কি না, এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—পরিষ্কার জল, খুব তোড়; তৃপ্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া শরীরের গ্লানি অপনোদিত হইল। আমাদের সঙ্গে রশুই-ব্রাহ্মণ গিয়াছিল। প্রায় অপরাহ্নে তিন জনে আমোদ করিয়া

সপরিতোষে 'হবিষ্যি' করা গেল। মনিবদের দেখাদেখি বামুন চাকরেরও সে দিন হবিষ্যি মঞ্জুর হইয়াছিল। চমৎকার চাল, সুন্দর ঘি, গয়ায় আতপ চাউল ও ঘৃত উৎকৃষ্ট দেখিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় কিছু সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইবে বাসনা হইয়াছিল।

বৈকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু আসিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পাকা লোক তিনি। আমাদের পারিবারিক গয়ালী ঠাকুরের ম্যানেজার বাবুকে ডাকাইয়া যেখানকার যাহা দরকার ফর্দ্দ করিয়া সকল ব্যবস্থাই করিলেন, মায় ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন পর্য্যন্ত। আমাদের কাহাকেও আর কোন বেগ পাইতে হয় নাই। তাহার ফর্দ্দের মধ্যে 'সুফল' বাবদে মোটা টাকা ধরা হইয়াছে দেখিয়া আমি একটু নিষ্কাম ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টায় ছিলাম—অর্থাৎ ফল কামনা যখন আমি করি না, তখন 'সুফল' নাই পাইলাম। উত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে গয়ালী ঠাকুরদের অসীম প্রভুত্ব। ম্যানেজার বাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, পুরোহিতটি যেন ভাল হয়, মন্ত্র ঠিক চাই।

প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান সারিয়া লইলাম। আমরা দ্বিতল গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, সেইখানে স্নানাগার, যে তোড়ে জল পড়িতে লাগিল, কলিকাতায় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অমন পাওয়া যায় না; তাহার উপর আবার চব্বিশ ঘণ্টা জল—দিন রাত কখনও বিরাম নাই। শুনিলাম ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের এক শৃঙ্গের উপর ট্যাঙ্ক আছে, তথা হইতে ঝরণা ও ইঁদারা হইতে সংগৃহীত পরিষ্কার জল আপন বেগে নামিয়া সহরের বাড়ীতে আবশ্যক মত তিন চারি তোলা পর্য্যন্ত তোড়ে উঠিয়া যায়। স্নানান্তে বিশ্রাম করিতেছি, খবর পাইলাম গয়ালি ঠাকুরের গাড়ী আসিয়াছে এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ম্যানেজার বাবুও উপস্থিত। ভাগিনেয়ের শরীর ভাল ছিল না,

তিনি যাইতে পারিলেন না, অপর আত্মীয়টি সঙ্গে চলিলেন, তাহার হাতে রহিল টাকা পয়সা সিকি দুয়ানির থলিয়া। গয়ায় যেথানে যবে যখন গিয়াছি ইনি ববাবর আমার সাথী ছিলেন। আমাকে কোন কষ্ট পাইতে দেন নাই।

প্রথম যাইতে হইল ফল্গু তীব। গাড়ী নদীর কিনারা পর্য্যন্ত যায় না, পাহাড়িয়া স্থান, অসমতল পথ, একটু দূরে অবতরণ করা গেল; সেখানে পুরোহিত ঠাকুর আমাব জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি আসিতেই তিনি পিণ্ডের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আমাকে নদীর জলে লইয়া গেলেন। জলে নামিয়া স্পর্শ স্নান ও তর্পণাদি হইল। গয়া মহাত্ম্য অনুসারে ফল্গু ধারা বিষ্ণু শরীর। ভিখারী বালকেরা চতুর্দ্দিকে জলে দাঁড়াইয়া স্বর্ণদানের ফলের কথা চীৎকার করিয়া শুনাইতেছিল, তৎস্থলে তাম্রদান হইয়া গেল। জলের কাজ সারিয়া আমরা তীরে সোপান সংযুক্ত একটি পাকা চাঁদনির উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম গয়ালী ঠাকুরের লোকেরা একপার্শ্বে আমার করণীয় শ্রাদ্ধের উপকরণাদি গুছাইয়া রাখিতেছে তৎসঙ্গে রজত নির্ম্মিত তৈজসপাত্র কয়টি ছিল; শুনিলাম আমার দানের জন্য গয়ালী ঠাকুর পাঠাইয়াছেন। তাঁহারই জিনিষ, তাঁহাকেই দান করিতে হইবে! বেশ ত প্রথা। যাহা হউক পুবোহিত ঠাকুব সকল সামগ্রী মিলাইয়া লইতেছেন আমি আস্তীর্ণ কুশেব উপর দক্ষিণ মুখ হইয়া বসিয়া আছি, দেখিতেছি সেই চাঁদনির ভিতর অন্যান্য স্থানে কত নর নারী—পাড়াগেঁয়ে লোকই বেশী—পিণ্ড দান করিতে বসিয়া গিয়াছে। পাঠশালের পড়োর মত এক এক দলকে একজন করিয়া পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছে; তাহার ভিতব 'নম বিষ্ণ্য' আছে, হিন্দুস্থানী পুরোহিতের মুখে উচ্চারিত বাঁকা বাঁকা কথায় 'পিতৃলোক উদ্ধার হইলো' 'মাতৃলোক উদ্ধার হইলো' আছে এমন কত কি মন্ত্র উদ্ভট ভাষায় আওড়ান হইতেছে; অধিকাংশ মন্ত্রের অর্থ আবিষ্কার করা দুস্কর। পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুরকুল উদ্ধারকামী ভক্ত হিন্দুগণ

যাহা শুনিতেছে তাহাই বলিতেছে বা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, সময়ে সময়ে এক বলিতে আর হইয়া যাইতেছে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। মন্ত্র পড়াতে পড়াতে পুরোহিত কখন বা কাহাকেও ধমক দিতেছে—মন্ত্র বলিতে বলিতে গল্প করিতে নাই; কাহাকেও বকিতেছে এত অল্প দক্ষিণায় পূরা ফল মিলিবে না; কাহাকেও বা বুঝাইতেছে এ ভুজ্যির এই দক্ষিণা, ও ভুজ্যির পয়সা কই? মন্ত্র পড়ান অপেক্ষা পয়সার দিকে দৃষ্টি বেশী বেশ বুঝা যাইতেছে। নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে স্ত্রী-পুরুষের মুখ দিয়া সংস্কৃত ভাষার মন্ত্র উচ্চারণ যে কি অদ্ভুৎ, যিনি নিজে না শুনিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। পুরোহিতেরাও দেখিলাম বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, যজমানের বোধগম্য করাইবার উদ্দেশ্যে স্থলে স্থলে সংস্কৃত ছাড়িয়া ভাষায় মন্ত্র পড়াইতেছেন। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিলাম সস্ত্রীক পিণ্ডদান করিতে বসিয়াছেন, সুন্দর চেহারা, মাথায় টেরি, চোখে চশমা, গরদের নগ্‌দি যোড় পরা—মন্ত্র পড়িতে পড়িতে একটু অবসর পাইলেই সিগারেট টানিয়া লইতেছেন অদ্ভুৎ দৃশ্য! এমন দলে দলে কত লোক বসিয়াছে, কত লোক দাঁড়াইয়াছে। এক একটি কিম্বা কয়েকটি দল লইয়া মির্‌জাই আঁটা খোট্টা পুরোহিত চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করাইতেছেন। একজন মাত্র বাঙ্গালী পুরোহিত দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গালী বাবুদের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব। তিনি পূর্ব্বরাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ দিন অমাবস্যা পার্ব্বণ দিন, একা আমার জন্য সমস্তক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই সুতরাং তাঁহাকে পাই নাই।

যাহা হউক আমার যিনি পুরোহিত হইয়াছিলেন, তিনি শিষ্ট শান্ত পণ্ডিত লোক, সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ মন্ত্রাদি স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে সক্ষম। তাঁহাকে পাইয়া আমি সন্তুষ্টই হইয়া ছিলাম। আমি তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া রাখিলাম আমার পরিবার বৃহৎ। ১৩৫ জন লোকের পিণ্ডদান করিতে হইবে

আমি নামের ফর্দ্দ করিয়া আনিয়াছি। তিনি ফর্দ্দখানি হাতে ধরিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। অধিকাংশই তর্পণ শ্রাদ্ধ মন্ত্র। আমি পিতৃপক্ষে বাৎসরিক তর্পণ করিয়া থাকি, সুতরাং প্রায় আমার সমস্ত কণ্ঠস্থ আছে। পুরোহিত ঠাকুর খেই ধরাইয়া দিতে লাগিলেন, আমি গড় গড়্ করিয়া আওড়াইয়া গেলাম, দেখিয়া ঠাকুরও ভারি খুসি। আপনা আপনি মন্ত্র পড়িতে আমাদের মত লোকের এক স্থলে শুধু সামান্য গোল হয়, 'গঙ্গোদক' মুখস্ত হইয়া আছে, এখানে তৎ স্থানে বলিতে হয় 'ফল্গুদক'। শ্রাদ্ধ স্থানে পিণ্ডদান ক্রিয়া হইয়া গেলে পর, সেই পিণ্ডরাশি ফল্গু জলে ফেলিয়া দিতে হয়। জলে ফেলিবার সময় অপর এক পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া মন্ত্র পড়াইলেন, এ কার্য্য তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট। গয়া ক্ষেত্রে ফল্গু তীরে আমার পিণ্ডদান সুসম্পন্ন হইল। সেখানে উপস্থিত বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ফকির ভিখারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রায় সকলকেই কিছু কিছু দান করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের অনুসরণ ক্রমে আমরা পাশের পথ দিয়া বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

বিষ্ণুপদ—গদাধর পাদপদ্ম এইখানে। সে দিন অমাবস্যা। অনেকে শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, মন্দিরে বিলক্ষণ ভিড়। গয়ালী ঠাকুরের ম্যানেজার বাবু বরাবর সঙ্গেই ছিলেন, বলিলেন, দুয়ার বন্ধ করাইতে হইবে নহিলে ভিতরে যাইতে পারিবেন না। কয়টি টাকা চাহিয়া লইলেন, কি উদ্দেশ্য তখন বুঝিতে পারি নাই। তিনি দুয়ার বন্ধ করাইতে গেলেন। আমরা দরদালানে উঠিলাম, দেখিলাম মন্দিরের প্রকোষ্ঠ দ্বার রুদ্ধ। দ্বারের সম্মুখে বৃহৎ ঘণ্টা লম্বমান, ভক্তেরা ঢং ঢং বাজাইতেছে, বোধ হয় দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। পুরোহিত ঠাকুর আমাকে লইয়া মন্দির প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ চাঁদনির এক পার্শ্বে বসাইয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন, এইখানে রূপার বাসনগুলি উৎসর্গ করা হইল। চন্দন-চর্চ্চিত কলেবর গয়দের জোড়

পবিহিত সুন্দর মূর্ত্তি জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুর—শুনিলাম এই মন্দিরের গয়ালী—আমাদেব নিকটে আসিয়া আহ্বান করিলেন, তিনি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া যাইবেন। দরদালান হইতে প্রাঙ্গনে নামিয়া মন্দির প্রকোষ্ঠের প্রধান দ্বাব পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ কবিতে হইবে। দ্বারেব সম্মুখে ভয়ানক জনতা—ঠেলাঠেলি। চাব পাঁচ জন জোয়ান লোক সম্ভবতঃ এই গয়ালী ঠাকুরেব আত্মজন দুয়ার আগলাইয়া আছেন, জনসাধাবণকে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। আমার দুয়ার বন্ধের ফি জমা দেওয়া হইয়াছিল, সুতবাং আমাদের পক্ষে অবারিত দ্বার। গয়ালি ঠাকুব ভিড় ঠেলিয়া আমাকে—আমার আত্মীয়টিকে ও পুরোহিত ঠাকুবকে কোনক্রমে ভিতবে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

ভিতরে গিয়া দেখি ছোট একটি কামবা, অন্ধকার, লোকে পূর্ণ, ঠেসাঠেসি বলিলেও হয়। দুয়াব-বন্ধ-ফি মানে হইতেছে আমার মত এই প্রকাব যিনি যিনি অগ্রিম প্রবেশ মূল্য দিয়াছেন, তিনিই এই সময়ে ভিতবে ঢুকিতে পাইয়াছেন; যাহারা তাহা দেন নাই তাঁহাবা বাহিবে ঠেলাঠেলি করিতেছেন। সেই কক্ষটিব মেঝিয়াতে মধ্যস্থানে খানিকটা অগভীব গর্ত্ত মত—পাড় কোণবিশিষ্ট প্রায় গোলাকাব, রৌপ্য-পাত-মণ্ডিত। সেই গর্ত্ত মধ্যে বিষ্ণুপদ, সেই গদাধর পাদপদ্মের উপর পিণ্ডদান করিতে হয়। পাদপদ্মযুগল কৃষ্ণবর্ণ পাথবেব উপর অঙ্কিত—খোদিত। রাশি রাশি পিণ্ড ফুল তুলসি প্রক্ষিপ্ত হইয়া পদমূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে, লোক আছে, মধ্যে মধ্যে চাঁচিয়া তুলিয়া লইতেছে; আবার সেই শ্রীপাদপদ্ম লোকের নয়ন গোচর হইতেছে। ভিড় ঠেলিয়া কোন ক্রমে কষ্টে-সৃষ্টে সেইরূপ বাঁধান পাড়ের ধাবে উপবিষ্ট হইলাম; পুরোহিত ঠাকুর পাশে বসিয়া মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। সেখানে মন্ত্রে ছিল 'ফল্গুতীরে' এখানে মন্ত্রে বলিতে হয় 'গয়াশিরে বিষ্ণু পাদপদ্মে'। বলিয়া দিলেন, ছোলার মত ছোট ছোট পিণ্ড গড়িয়া ঐ পাদপদ্মাভিমুখে নিক্ষেপ করিতে। নইলে কুলাইয়া উঠিবে না।

আমি পিণ্ডের আধারপাত্র কোলে লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে নামে নামে পিণ্ড প্রক্ষেপ করিতে লাগিলাম। অন্যান্য অনেকেই তাহাই করিতেছিলেন নিকটে বসিবার স্থান না পাইয়া কেহ কেহ দূর হইতে পিণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিতেছেন, পাদপদ্ম পর্য্যন্ত না পৌছাইয়া যেখানে সেখানে পড়িতেছে। কোন কোনটি আমার মস্তকোপরি পড়িতে লাগিল, নিষেধ করিবার অবকাশ নাই, আর সেই গোলমালের ভিতর নিষেধ শোনেই বা কে? মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ পাদপদ্মের উপর হুড় হুড় করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছেন বোধ হয় ফল্গুবক পিণ্ড রাশি ধুইয়া গিয়া পাশে পাশে পড়িতেছে। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ যুগল ধৌত করিয়া দেওয়াই বোধ হয় উদ্দেশ্য। এই চরণ স্থাপিত গয়াসুরের মস্তকে। শুনিয়াছি কেহ কেহ বহুদূর হইতে বহু কষ্ট করিয়া গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিয়া এখানে এই বিষ্ণু পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়া বহু পুণ্য অর্জ্জন করেন। কে একজন পিছন হইতে এমন ভাবে ছুঁড়িয়া জল ঢালিলেন যে সেই জল শ্রীবিষ্ণুর পাদাঙ্কের উপর না পড়িয়া, পড়িল আমার মস্তকোপর! একে মাথায় বিরাজ করিতেছিল অপরের প্রক্ষিপ্ত পিণ্ডাংশ-সম্ভার, এখন তাহা এই জলে ধৌত হইয়া গড়াইয়া বদন মণ্ডলময়, বক্ষে স্কন্ধে! অপরূপ চেহারা হইয়া দাঁড়াইল! কিন্তু তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করা চলে না। সকলের নামে নামে পিণ্ড দান করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম আত্মীয়টি আমার অবস্থা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর ভারি খুসি, বলিলেন সুন্দর! গদাধর পাদপদ্ম বাবুজীর শিরপর! আমি উঠিবা মাত্র সম্মুখস্থ দালানের দিকে মন্দির প্রকোষ্ঠের অপর একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল, হুড়মুড় করিয়া বাহিরের লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিষ্পিষ্ট হইতে হইতে কোন গতিকে রৌপ্যপাত মণ্ডিত দ্বার পথে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অবস্থা দেখিয়াই সকলেই আমার পানে চাহিতে লাগিল আর হাসিতে লাগিল। গুটিকতক বঙ্গমহিলা একত্র এক

স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহারা যখন পরস্পর গা-টেপাটেপি করিয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে দন্তরুচি কৌমুদী বিকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আমায় লজ্জিত হইয়া উঠিতে হইল। ম্যানেজার বাবু রুমাল বাহির করিয়া আমার মাথা মুখ ঝাড়িয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটু দম্ লইতে আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গ্রাণাইট প্রস্তরে গঠিত বৃহৎ মন্দির, স্তরে স্তরে গাঁথনি, উপরে স্তরে স্তরে চূড়া উঠিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে কুলঙ্গির মত ছোট ছোট খিলান, কোন কোনটির মধ্যে দেবমূর্ত্তি, কোন চূড়ার উপর রঙ্গিন পতাকা উড়িতেছে, সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর স্বর্ণকলস, সে প্রায় শত ফিট উর্দ্ধে। শুনা যায় বর্ত্তমান মন্দিরটি খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীরাজ্ঞী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন দালান দ্বিতল স্তম্ভমণ্ডলী শোভিত, সমুচ্চ গুম্বোজাকার খিলানের ছাদ। খিলানের চূড়ায় চিত্র বিচিত্র আকারের স্বর্ণ কলস; দালানের কোলে তিন দিকে অলিন্দ, তাহার গায়ে কয়েকটি করিয়া ধাপ; মন্দির ও দালান সমস্ত এক প্রশস্ত প্রাঙ্গনে অবস্থিত। প্রাঙ্গনে এক পার্শ্বে বিষ্ণুমণ্ডপ আছে তথায় গদাধর মূর্ত্তি বিরাজমান। এই প্রাঙ্গনের ধারে ধারে রোয়াক, তাহার উপর ভিত্তি বা দেয়াল। রোয়াকের গায়ে, দেয়ালের গায়ে মধ্যে মধ্যে কুলঙ্গির মত, তাহাতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি অসংখ্য। সমস্তই গ্রাণাইট পাথরে গঠিত বা উৎকীর্ণ। স্পষ্ট বুঝা যায় কোন কোন মূর্ত্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত, কিন্তু হইলে কি হয়, হিন্দুর অধিকারে আসিয়া সকল মূর্ত্তিই এখন হিন্দু দেবদেবীর সংজ্ঞা পাইয়াছে এবং ফুল তুলসী সিন্দুর চন্দনে পূজা পাইতেছে। সিন্দূরের কথা বলিলাম, কারণ এই বৈষ্ণব আয়তনের মধ্যেও শক্তি মূর্ত্তির অভাব নাই। প্রাঙ্গন পার্শ্বে গয়েশ্বরী দেবীও রহিয়াছেন—অষ্টভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি। মন্দির সীমানার বাহিরে দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে একটি গভীর সরোবর আছে নাম সূর্য্য-কুণ্ড, জল অপরিষ্কার মনে হইল। তাহার

পশ্চিম তীরে সূর্য্যদেবের মন্দির বিদ্যমান। তন্মধ্যে সুন্দর সূর্য্য মূর্ত্তি, মূর্ত্তির পাদপীঠে অরুণ চালিত সপ্তাশ্ব রথ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরটি স্তম্ভ শোভিত, দূর হইতে 'বাঙ্গলা' গোছ মনে হয়—প্রাচীন সন্দেহ নাই কিন্তু দেয়ালে চুণকাম করা কলি ফিরানো, সুতরাং নবনির্ম্মিতের ন্যায় দেখায়। নিকটে আশে-পাশে অন্যান্য দেব মূর্ত্তিও আছে, আমাদিগের দেখিবার সময় হইয়া উঠে নাই, এখনও আমার কাজ বাকি, অক্ষয়বটে যাইতে হইবে। গয়াক্ষেত্রে গয়াশিরে বিষ্ণুপাদপদ্মে আমার পিণ্ডদান ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

এখানকার কাজ সারিয়া অক্ষয়বটে যাইতে হয়। অক্ষয়বট, বিষ্ণুপদ হইতে আধ ক্রোশটাক দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গয়ালী ঠাকুরের ল্যাণ্ডো আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া সীতাদেবীর সাক্ষী বটবৃক্ষের উদ্দেশে যে তীর্থ স্থাপিত হইয়াছে, তদভিমুখে যাত্রা করা গেল। আসিবার সময় গাড়িতে ম্যানেজার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাড়ীতে সুফল লইবেন কি অক্ষয়বটে লইবেন। তীর্থক্ষেত্রে লওয়াই শ্রেয় মনে হইয়াছিল, আমি তদনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তিনি নামিয়াই প্রভুর সকাশে খবর পাঠাইয়া ছিলেন। এই তীর্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অর্থাৎ উচ্চভূমিতে অবস্থিত। গাড়ী একটু দূরে দাঁড়াইল, আমরা নামিয়া খানিক ঢালু পথ ও দফে দফে কয়েকটি ধাপ উঠিয়া তীর্থপ্রাঙ্গনে উপনীত হইলাম। একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গন, তাহার এক পার্শ্বে দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির, মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এক বিশাল বট তরু—প্রাচীন বৃক্ষ মনে হয়। পরে বুদ্ধগয়া ভগবান বুদ্ধদেবের ধ্যান স্থানে যে বোধিদ্রুম দেখিয়াছি, এ বৃক্ষ তাহা অপেক্ষা পুরাতন সন্দেহ নাই। এই বটবৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে লতাইয়া জড়াইয়া অন্যান্য গাছপালাও উঠিয়াছে। বৃক্ষের পার্শ্বে চত্বরে পুরোহিত ঠাকুর আমাকে বসাইলেন। এখানেও মন্ত্র পড়িতে হয়, পিণ্ডদান করিতে হয়। ফর্দ্দ দেখিয়া নামে নামে পিণ্ড

স্পর্শন করিলাম। তিন স্থানে পিণ্ড দেওয়া হইল। কার্য্য শেষ হইলে পূতপাদপদ্মমূলে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণা দিয়া কোন একটি ফল চিরজীবনের জন্য ছাড়িবার অঙ্গীকার করিতে হয়। সে পাণ্ডা—তিনিও গয়ালী বা গয়ালী-শ্রেণীর শুনিলাম সে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন—জামা টুপি পরিহিত তিনিও পিতৃকুল উদ্ধারক মন্ত্র পড়াইলেন। তাঁহার পর 'ফল' সম্বন্ধে কি বলিলেন, আমি পাদপদ্মের বেদীর উপর তাঁহার দক্ষিণা রাখিতে রাখিতে, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 'ফল' কথাটা কাণে আসিতেই নিষ্কাম ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আমার কোন ফল কামনা নাই জানাইয়া আমার ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় দিতে গেলাম। পরে শুনিলাম আকাশ কুসুমের মত আসমান-ফলের কথা তিনি বলেন নাই, আসল ফলের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গোলেমালে বিশেষতঃ বৃক্ষমূলে দেয় দক্ষিণা লইয়া আমার পুরোহিত ঠাকুরের সহিত তাঁহার সামান্য একটু বচসা উপস্থিত হওয়াতে আমি বাঁচিয়া গেলাম কোন ফলই ত্যাগ করিবার জন্য বচনবদ্ধ হইতে হইল না। আমার ভুল সংশোধনের চেষ্টা হয় নাই। পীড়াপীড়ি করিলে নোনা কি ডাড়িম ছাড়িতাম।

বটমূল হইতে আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ মন্দিরের দেবতাকে প্রণামী দিয়া দর্শন করিলাম। তিনি মহাদেব। এইবার বিশ্রামের পালা। গয়ার কৃত্য আসল কাজ সমস্ত আমার হইয়া গেল। গয়া ক্ষেত্রে অক্ষয়বট তীর্থে পিণ্ড-দান ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কষ্ট হইবে বলিয়া কিম্বা অধিক বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া কোথাও কিছু কোন অঙ্গ বাদসাদ দেওয়া হইয়াছে কি না। তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, যাহা দস্তুর, যাহা প্রথা, যাহা করণীয় সমস্তই সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে, কিছুই বাদ যায় নাই। আমি প্রশ্ন করিলাম, শুনিয়াছি লোকে গয়ার কাজ করিতে তিন দিনে তিন স্থানের কাজ নির্ব্বাহ করে, সেই জন্যই

গয়াধামে ত্রিরাত্রি বাস করিবার নিয়ম, কিন্তু আমাকে ত এক দিনেই তিন স্থানের ক্রিয়া করান হইল তাহাতে প্রত্যবায় হইবে না ত? তিনি ও ম্যানেজার বাবু দুইজনেই দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন, "সে কি? আপনি খরচ করিবেন, আপনি শ্রম করিবেন, আমরা ন্যায্য গণ্ডা পাইব, কাজের অঙ্গ বাদ দিব কেন? তিন দিনে কাজ সারিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। যাঁহারা ধীরে ধীরে মন্ত্র পড়েন, ধীরে ধীরে করণীয় কার্য্য করেন, অনেক বেলা হইয়া যায়, তাঁহাদের এক দিনে সমস্ত হইয়া উঠে না। তাই তাঁহারা রহিয়া বসিয়া তিন দিনে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন আপনার ত মন্ত্র সমূহ কণ্ঠস্থ।" শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মনস্কামনা পূর্ণ। কাজের ছিটে একটুখানি বাকি আছে, আমাদের মতে তাহা কিছুই নয়; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের মতে সেইটিই প্রধান কাজ—'সুফল' লাভ। সকল কর্ম্মসুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যে সুফল তাহা আমার প্রাপ্য, আমি ত পাইয়া গিয়াছি। কিন্তু কাহারও কাহারও বিশ্বাস, গয়ালী ঠাকুরের পা পূজা করিলে কেবল ফুল চন্দনে নয়, রজতখণ্ডাদি (স্থলবিশেষে হীরা জহরত) দ্বারা পূজা করিলে পর তবে তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া কথাটি বাহির হয় তখন, তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই নহে তখন পিণ্ডদাতার প্রাপ্তব্য প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ সে ব্যক্তির কর্ম্মফল সুফল স্বরূপে লাভ হয়। সেইটুকুর শুধু অপেক্ষা। গয়ালী ঠাকুরের জন্যই এখন আমাদের অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তিনি এখনও আসিয়া পৌছান নাই। ম্যানেজার বাবু বলিলেন তিনবার খবর পাঠাইয়াছি এখনি আসিয়া পড়িবেন।

এই প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি ছোট পাকা ইমারত আছে, সাম্‌নে একটু দালানের মত। দেখিলাম সেখানে একখানি ভাল খাটিয়া পাতা আছে, তাহার উপর সুন্দর পোষাক পরিহিত তাজ মাথায় একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পায়ের কাছে জানু

পাণ্ডিয়া বসিয়া একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ফুল মালা প্রভৃতি লইয়া কি করিতেছেন। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম ব্যাপারটা কি, কেন না আমাকেও সেই হাড়কাঠে মাথা গলাইতে হইয়াছিল একটু পরে। কয়েকটি পাঠা বলি যখন হয়, সে সময়ে একটি করিয়া বলিদান দেওয়া হইতে থাকে, বাকিগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জাত ভায়ের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে। আমার দশা তদ্রূপ নহে কি?

আমি সে স্থান হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিলাম। বেশী দূরে যাইতে হইল না, একজন ইজার চাপকান পরা, জরীর টুপি মাথায় হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া হাতজোড় করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাইজার ফ্যাসানের তাহার গুম্ফ, আমি তাঁহাকে উচ্চপ্রদস্থ কোন রাজ-কর্ম্মচারী ঠাওরাইয়াছিলাম। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু সহাস্য মুখে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যেন কত দিনের আলাপী লোক। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম তিনিও একজন গয়ালী এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি। তিনি ক্ষুব্ধ ভাবে অনুযোগ করিলেন--তাহার অন্ন ধ্বংসের উদ্যোগ হইতেছে কেন? গয়ায় আসিয়া আমার উঠিবার কথা ছিল অমুক বাবুর বাড়িতে, তিনি সেই আশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছেন; উপস্থিত যে বাড়িতে উঠা হইয়াছে, অকস্মাৎ সেখানে আসা হইল কেন? ষ্টেসনে তাঁহার লোক ছিল, তাঁহাকে খবর করা হয় নাই কেন—ইত্যাদি নানান্ বায়নাক্কা, আসল কথা, কাহার খাতায় আমাদের পরিবারস্থ অনেকের দস্তখত আছে। বুঝিতে পারিলাম, আমাদের গয়ালা ঠাকুরেরা দুই সরীক্। এক সরিকের পাল্লায় আমি পড়িয়াছি, অপর সরীকের তাহা গায়ে লাগিয়াছে; তাই এত অনুযোগ। জানিতে পারিলাম, ইনি আমার মত একজনকে 'সুফল' দিয়া চরিতার্থ করিতে অত্র শুভাগমন করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইয়া গিয়াছে, কোথা হইতে আমার সন্ধান পাইয়া ওৎ পাতিয়া বসি।

ছিলেন। ঠাকুরজী বাসায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন গোসাইরা উপস্থিত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আমার যিনি গয়ালী ঠাকুর তিনি সশরীরে দর্শন দিলেন। দিব্য ধোপদস্ত ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরণে, ধব্‌ধবে চুনট্ করা আস্তিন হাল ফ্যাসেনের আদ্ধির পাঞ্জাবী গায়ে, ফব্ চেইন, সোনার বোতাম, আঙ্গুলে হীরার আংটি-পান্নার আংটি, মাথায় চিকণ কাজ করা আদ্ধির টুপি, ফিট বাবু আমাকে 'সুফল' প্রদান করিতে শুভাগমন করিয়াছেন। দেখিয়া ত আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। আমি জানাইলাম, ঠাকুরজীর জন্য অনেক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছি, আমার কাজকর্ম্ম আগে চুকিয়া গিযাছে। অম্লান বদনে তিনি বলিলেন 'কি করিব বাব, আমার গাড়ী আপনাকে দিয়া রাখিয়াছি, হাঁটিয়া আসিতে হইল তাই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।' কৈফিয়ৎ শুনিয়া আমাকেই অপ্রস্তুতে পড়িতে হইল। যাহা হউক, তিনি সঙ্গের পরিচারককে মালা ফুল জল আনিতে আদেশ করিলেন। আমার গলায় মোটা মালা এক ছড়া অর্পন করিয়া বলিলেন 'এই খানেই বসুন।' পূর্ব্বোক্ত সেই কোঠায় সেই খাটিয়ার সমীপে যাইতে হইল না, তাহারই সন্নিকটে ফাঁকা জায়গায় প্রাঙ্গনের একধারে আমি বসিয়া পড়িলাম, বরদ দেবতার মত তিনি সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে যাহা বলিতে হইবে তিনিই বলিযা দিতে লাগিলেন, তাহার উত্তর আবার তিনিই সঙ্গে সঙ্গে দিতে লাগিলেন। হাত যোড় করিয়া আমি তাঁহার বুলী আওড়াইতে লাগিলাম। এই যেমন 'আমার কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল?' উত্তর 'হাঁ হইল।' 'আমি সুফল পাইলাম উত্তর 'হাঁ পাইলে।' এইরূপ দু চারিটি কথা, বেশী নয়। আমি ফল জল অঞ্জলি ভরিয়া চক্‌চকে টাকা তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে ঢালিয়া দিলাম। সুফলত মিলিল, মনে করিলাম কাজ শেষ হইয়াছে, উঠিয়া পড়িব কিনা ভাবিতেছি,

গয়ালী ঠাকুরের ইঙ্গিতে তাঁহার পরিচারক আমার যুক্ত হস্তের প্রকোষ্ঠে এক গাছি মালা জড়াইয়া দিল, আমাকে অঞ্জলি করিতে বলা হইল, করপুটে ফুল দিয়া জল ঢালা হইল। তখন গয়ালি ঠাকুর গম্ভীর ভাবে বলিলেন— 'আমার কি বার্ষিক বন্দোবস্ত করিবেন বলুন। আমার হাত বাঁধিয়া—যদিও ফল বন্ধন পবিত্র বারি হস্তে এই তীর্থ ক্ষেত্রে আমাকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লওয়া হইবে, কত করিয়া বার্ষিক প্রণামী তাঁহার চরণে দিতে হইবে। শপথের বাড়া অঙ্গীকার। আমি চটিয়া গেলাম; স্পষ্টই বলিলাম সে কথা এখন হইতে পারে না; উপস্থিত বিষয়ের সহিত বার্ষিক সম্বন্ধ নাই। তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না; হাতের জল আঙ্গুল গলিয়া ঝরিয়া যাইতেছে, তিনি অঞ্জলিতে আবার জল ঢালিতে আদেশ করিতেছেন। আমিও গোঁ ধরিয়া বসিলাম, কিছুতেই বার্ষিক স্বীকার করিতেছি না। তামাসা দেখিতে আমার চতুর্দ্দিকে লোক দাঁড়াইয়া গেল। ঠাকুরজী অনেক বুঝাইলেন, সকলেই ইহা করিয়া থাকে জানাইলেন, কিন্তু 'ভবি ভুলিবার নয়।' আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না। অন্য সময়ে এ প্রস্তাব করিবেন, বিবেচনা করা যাইবে। যখন তিনি বুঝিলেন এ শক্ত পাল্লা He has caught a Tartar তখন অপ্রসন্ন বদনে সরিয়া দাঁড়াইলেন, আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হাতের বাঁধন-মালা ছিন্ন হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মালা ফুল সেইখানে পড়িয়া রহিল, পরিচারক টাকা গুলি ধীরে ধীরে কুড়াইয়া লইল। গয়ালী ঠাকুর ঈষৎ যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাব ধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে এখন আর উপায় নাই। মনে হইতেছে অতঃপর তিনি অগ্রে বার্ষিক বন্দোবস্ত করাইয়া পরে সুফল দিতে চাহিবেন। এবার ঠকিয়াছেন। সে স্থান ত্যাগ করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন, তাঁহার ম্যানেজারও প্রভুর অনুসরণ করিলেন। আমরাই বা আর সেখানে করিব কি, প্রাঙ্গনের সোপান হইতে নামিয়াই

দেখি অদূরে সমতলভূমিতে একখানি নূতন ঝক্‌ঝকে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, অচিরে গয়ালা ঠাকুর হেলিতে দুলিতে যাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। এই অল্পক্ষণ আগে আমাকে তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের নিকট হইতে চরণ পূজা দাবি করিবার অধিকারী—এমন মহামান্য ব্যক্তি—এই পুণ্যক্ষেত্রে দশজনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত ভাবে নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—হাঁটিয়া আসিয়াছেন তজ্জন্য বিলম্ব। সৌভাগ্য আমাদের তাঁহার ন্যাণ্ডোখানি সঙ্গে করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যান নাই। কিন্তু ম্যানেজার বাবুকে মোটরে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। যান—এখন চটিলে আর ক্ষতি নাই, আমার কাজ আদায় হইয়া গিয়াছে।

গয়ালী প্রভুদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান আছে—গয়া তীর্থের সৃষ্টিকর্ত্তা গয় অসুরের দেহের উপর দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসম্ভার দান লইতে ব্রাহ্মণেরা সম্মত হয়েন নাই। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্দ্দশগোত্রবিশিষ্ট নূতন এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। তাহারা গয় শরীর সংশ্লিষ্ট সেই দান গ্রহণ করিলেন, তাহাদের নাম হইল 'গয়ওয়াল' (আমরা বলি গয়ালী)। ব্রহ্মার কৃপায় তাহারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল, এমন কি তাহারা মূর্খ হউক, অজ্ঞান হউক, চরিত্রবান না হউক, তথাপি তাহারা পূর্ব্বসৃষ্ট ব্রাহ্মণ বর্ণের নিকট হইতেও চরণ পূজা পাইবার অধিকারী হইল! ঠাকুরদের এ এক বুজরুকি! গয়ালী সম্প্রদায়ের পারিবারিক উপাধিগুলি বেশ কৌতুকাবহ; 'ঢেঁড়ি' 'নাক কোপা,' 'কাটারিয়া,' 'চড্যান্থার,' 'সিজোয়ার' ইত্যাদি!

অক্ষয়বট প্রাঙ্গন হইতে ধাপ কয়টি নামিয়া নীচে আসিয়াছি, যাইয়া গাড়িতে উঠিব, অমনি একটা লোক সানাই বাজাইতে বাজাইতে আমার আগে আগে চলিল। বলিতে ভুলিয়াছি, ফল্গুতে যাইবার জন্য সেই সর্ব্বপ্রথম যখন গাড়ী হইতে নামি, সেখানেও অমনি একজন সানাই বাজাইতে বাজাইতে

সম্মুখে চলিয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিয়াছিলাম। এখানে এক নূতনতর ভিখারী! সানাইয়ের আওয়াজ আমাদের প্রাণে শুভকর্ম্ম আনন্দ উল্লাসের সংবাদ আনয়ন করে, শোকস্মৃতির সহিত ইহা নেহাৎ বেখাপ্পা শুনায়। কিন্তু এখানকার প্রথা দেখিতেছি ভিন্ন রূপ।

গয়ালী ঠাকুরের ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছিল, পুরোহিত ঠাকুরকে বিদায় করিয়া আমরা দুজনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুরটি লোক খুব ভাল; তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইবার দক্ষিণা যাহা পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, তাহার উপর শেষকালে পারিশ্রমিক স্বরূপ মোট যাহা দিলাম, তাহা পাইয়া তিনি যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, আমাদের এখানকার রাঘব বোয়ালদের মত কিছুতে-পরিতৃপ্ত-নহে ভাব তাঁহার নাই।

বাসায় আসিয়া দেখিলাম, জল খাবার প্রস্তুত। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে কিছু খাইব না বলিয়া, বিছানায় একটু কাৎ হইলাম। মনে মনে মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম, সব নামে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছে কি না। ফর্দ্দখানি ফিরাইয়া আনিয়া ছিলাম, পড়িয়া দেখিলাম, কোন নাম ছাড় মনে হইল না। যদিও বিষ্ণুপদ কক্ষে ভিড়ে অন্ধকারে ফর্দ্দখানি ব্যবহার করিতে পারি নাই, অভ্যাস বশতঃ সকল নাম মুখস্ত ছিল। অল্পক্ষণ পরেই আমার ডাক পড়িল ব্রাহ্মণ ভোজনের সব প্রস্তুত। নীচে নামিয়া গিয়া দেখি জিনিষ পত্র যাহা আয়োজন হইয়াছে, বোধ হয় ত্রিশ চল্লিশ জনের খোরাক হইবে। মাত্র দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার কথা ছিল। ভাবিলাম বিস্তর সামগ্রী বাঁচিয়া যাইবে, তা হউক, সে বাড়ীতে লোকজন বড় কম নাই, অনেক-কে বিতরণ করা চলিবে। ভালই হইয়াছে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা আহারে বসিলেন—বোধ হয় ভোজপুরবাসী তাঁহারা, হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ শরীর। তাঁহাদের ভোজনের বহর দেখিয়া আমার ত তাক্ লাগিয়া গেল। অমৃতি আর বুঁদিয়া যেরূপভাবে লুসিতে লাগিলেন, দেখিয়া বুঝিতে

পারিলাম বাঙ্গালী ও ভোজপুরি মধ্যে সাধারণতঃ বলের এত পার্থক্য কেন? যাহা আমাদের মত ৩০।৪০ জনের খোরাক মনে হইয়াছিল, দ্বাদশ স্থলে না হয় চতুর্দ্দশটি বেহারবাসী তাহা প্রায় নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন—সামান্যই বাচিয়া ছিল। খাইয়া তাঁহারাও খুসী, খাওয়াইয়া আমিও খুসী। অমনতর ভোজন ব্যাপার দেখিতেও আমোদ। অবশিষ্ট অংশ হইতে আমার জন্য কিঞ্চিৎ 'প্রসাদ' আসিয়াছিল:—আটার মোটা মোটা শক্ত শক্ত পুরি, চিবাইতে মন্দ লাগিল না, মিষ্ট আছে। তরকারীও বেশ, সঙ্গে গোটা গোটা কাঁচা লঙ্কা অবশ্য চালাইতে পারি নাই। শাক কিম্বা ভাজি বড় সুমিষ্ট মনে হইল না; চাট্‌নি তোফা; দধি চলন সই, ঈষৎ গন্ধ গন্ধ লাগিল; রাবড়ি আদপে ভাল লাগে নাই—কাই-কাই পানা মিষ্টহীন, বোধ হয় বেশী পরিমাণে পালো মিশ্রিত। পেড়া চিনির ডেলা; বুঁদিয়া প্রভৃতি কলিকাতার আরও ভাল তৈয়ারী হয়। পান গয়ায় বেশ ভাল সাজা পাওয়া যায়।

খাইয়া দাইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া অপরাহ্নে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে ছাদে—প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড ছাদ, বেড়াইতেছি দেখিতেছি পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার অপর ধারে গোটা দুই তিন বড় বড় গাছে অসংখ্য বক জাতীয় পাখী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে, অস্ফুট স্বরে ডাকিতেছে, পালে পালে সেইদুই তিনটি গাছে আসিয়া বসিতেছে, বোধ হয় বাসা আছে। তাহাদের সম্বন্ধে এবং নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রথম-পরিচিত সেই চাপকান পরা গয়ালী ঠাকুর হাস্যমুখে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; পশ্চাতে তাঁহার কর্ম্মচারী বক্ষে বড় বড় খাতা। আসিয়াই ত আমাকে একটি কাল পাথরের সুন্দর বাটি ও এক রেকাব জাফ্‌রাণী পেড়া উপহার দিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন "এ কেমন হইল, আমাকে ছাড়িয়া অমুকের হাতে! এই দেখুন আমার খাতায় ইহাদের বাড়ীর সহি আছে।"

বলিয়া খাতা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিলেন, আমি খবর পাইয়াছিলাম, ইনি অমুকের কুঠিতে নামিবেন, আশায় ছিলাম এখানে আসিবেন, তা কি জানি, বাসা বদলের কারণ বা কি। কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার খাতায় দেখিলাম, আমাদের পরিবার মধ্যস্থ কাহারও কাহারও বাস্তবিকই দস্তখত রহিয়াছে বটে। কাহারও কাহারও আদেশ—পরিবারস্থ যে কেহ গয়া করিতে আসিবেন, ইহাকেই গয়ালী করিতে হইবে ইত্যাদি। আমি তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে পারি নাই, কিন্তু যাহা করিয়াছি ন্যায় বিরুদ্ধ হয় নাই, কারণ তাহারাও আসল সরিক। গয়ালি ঠাকুরকে পাঁচটি মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিলাম, তিনি ধরিয়া বসিলেন, আমাকেও তাঁহার এই খাতায় এই প্রকার লিখিয়া দেওয়া হউক, আমি তাহাতে সম্মত হইতে পারিলাম না, তবে তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় পত্র একটি Certificate লিখিয়া দিলাম। অগত্যা তাহাতেই তিনি তুষ্ট। বলিলেন 'চলুন, দেওয়ালি দেখিয়া আসা যাক্।' সেটি দেওয়ালি রাত্রি। আমি বলিলাম, 'আমাদের প্রথা যেদিন শ্রাদ্ধাদি করা যায়, সেদিন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে নাই।' তিনি উত্তর করিলেন, 'কোন নিয়ম নাই, আসুন আমার মোটরে চাপিয়া বেড়াইয়া আসিবেন। আমি সম্মত হই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত দিন গয়ায় অবস্থান করা আমার অভিপ্রায়, এখানে আর কোথাও যাওয়া আমার ইচ্ছা আছে কিনা।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু নিজেই উত্তর দিলেন, 'কয়দিন এখানে থাকিবেন ঠিক নাই, আগামী কল্য বোধগয়ায় বেড়াইতে যাইবেন ইচ্ছা আছে।' শুনিয়া তিনি ক্ষুন্নমুখে কহিলেন 'বেশ, কখন যাইবেন বলুন আমার মোটর আসিবে তাহাতে চাপিয়া বেড়াইয়া আসিবেন, দশ মিনিটে পৌঁছাইয়া দিবে।" এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না। এ গয়ালী ঠাকুর লোক ভাল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু তাঁহাকে কোন এক দরিদ্র ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি

তৎক্ষণাৎ আমার প্রদত্ত টাকা পাঁচটি তাঁহার হস্তে অর্পন করিলেন। টাকা কয়টার সদ্ব্যয় হইয়া গেল।

এইখানে বলিয়া রাখি আমার অর্চ্চিত সেই যে গয়ালী ঠাকুব, তিনিও ম্যানেজার বাবুব মারফৎ তাঁহার খাতা আমার দস্তখতের জন্য পরে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার Ledger Book মত বিলাতী বাঁধাই খাতা, লম্বাচৌড়া ভাল কাগজে সুন্দর মলাট। অনুরোধ অনুযায়ী তিন পুরুষের নাম এবং তিনি আমাকে কাজ করাইয়াছেন লিখিয়া দিলাম। বার্ষিক স্বীকাব করিলে হয়ত ইহাতে লিখিয়া দিতে হইত। যাক্ সে বালাই নাই।

পর দিন প্রাতে জলটল খাইয়া আমরা রামশিলা পাহাড় দেখিতে বাহির হইলাম। বামশিলা গয়া সহবের উত্তর সীমানা বলিলেও চলে; গ্র্যাণাইট প্রস্তর গঠিত, উচ্চে ৩৭২ ফিট। ইহার শিখবে একটি ছোট মন্দির আছে, মন্দিরে পৌছিবার জন্য পাকা গাঁথনি সোপানাবলী আছে; বেশ চওড়া চওড়া পাথরের ধাপ, মধ্যে মধ্যে চাতাল। উঠিবার পক্ষে যতটা সুবিধা করা চলে, তাহা করা হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই সোপানাবলী কলিকাতার সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পরিবার বসু বংশীয় ধর্ম্মপ্রাণ স্বর্গীয় কৃষ্ণরায় বসু মহাশয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত। বসুজ মহাশয়ের ইহা এক অতুল কীর্ত্তি। আমরা উপরে উঠিয়াছি। মন্দির মধ্যে রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজমান, সম্মুখে দালানে পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গ মহাদেব। আমি পূজা দিলাম, পাণ্ডারা অদ্ভুৎ ভাষায় মন্ত্র পড়াইলেন, শুনিয়াছি এই লিঙ্গমূর্ত্তির তলদেশে যে বেদী রহিয়াছে, চক্রাকারে সেই বেদীতে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, বেদী মধ্যে পয়সা বা কোন মুদ্রা ছুঁড়িয়া ফেলিলে, ছিদ্র পথে প্রবিষ্ট হইয়া সেটি ঝণঝণ করিতে করিতে বহুদূরে চলিয়া যায়, শ্রুত হয়, কোথায় পৌছায় কে জানে? পাণ্ডারা বলে—পাতালে। আমরা পরীক্ষা করি নাই। মন্দিরের আশে পাশে ছোট ছোট অন্যান্য দেবতাও আছেন, হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিও রহিয়াছে, সমস্তই

গ্র্যাণাইট পাথরের, কোন কোন মূর্ত্তি বৌদ্ধদিগের বলিয়া সন্দেহ হয়। প্রণামী দিয়া সকল মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। মন্দিরটির নীচেকার অংশ প্রায় একতালা সমান বহু প্রাচীন স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহার উপরকার অংশ তত প্রাচীন না হইতে পারে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব প্রাঙ্গন পাহাড়ের শিখর দেশ আলিসার সীমা রেখা আছে। আমরা দক্ষিণ পশ্চিমে এক পার্শ্বে আলিসার উপর গিয়া বসিলাম। দক্ষিণ দিকে নীচে সমস্ত গয়া সহর বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল, বাড়ী গুলি ছোট ছোট যেন খেলানার ঘর, কোথাও সারি সারি, কোথাও যত্র তত্র। পশ্চিমে সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র, বিস্তৃত প্রান্তর চিত্র বিচিত্র যেন একখানি পট। আরও দূরে দূরে দিক্ চক্রবালে মেঘাকার পর্ব্বতমালা ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়া আমরা নামিয়া আসিতে লাগিলাম। সোপানাবলীর পাশে পাশে কোথাও এক আধ টুকরা ভগ্ন বৌদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া ভস্মমাখা 'সাধু' বেশ একটি আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছেন। হিন্দু দেবতার নাম আওড়াইয়া প্রণামী আদায় করিতেছেন। সিঁড়িময় ভিখারী অসংখ্য, একটা আধলা পয়সা পাইলেও খুসি। আমরা পারতপক্ষে বঞ্চিত করি নাই।

আসিবার সময় পাহাড়ের তল দেশে যখন উপস্থিত হই, উপরে উঠিবার পথ দেখিতে পাইতেছিলাম না,রাস্তা হইতে চোখে পড়িতেছিল পরিসরবিশিষ্ট অল্প কয়েকটি ধাপ,তাহার উপর অপ্রশস্ত এক প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গনে রোয়াকের উপর একটি দেব মন্দির উঠিয়াছে। নূতন চুনকাম করা পরিষ্কার-ঝরিষ্কার। উপর পানে উঠিতে হইলে সেই মন্দির সন্নিধানে পৌছাইতে হয়। জুতা পরিয়া আমারা সিড়িতে উঠিব কি না ভাবিতেছি, জুতা খুলিবারই উপক্রম করিতেছি, পার্শ্বস্থিত একজন দোকানী বলিয়া দিল, "যান্ বাবু জুতা পায়ে উপরে যাইতে পারেন, মন্দিরের পাশ দিয়া ঐ সিড়ি দেখা যাইতেছে, উহাই

রামশিলায় উঠিবার রাস্তা।" আমরা সঙ্কোচ সহকারে জুতা শুদ্ধ উঠিলাম। নামিবার সময় আমারা সেই প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সেই অপ্রশস্ত প্রাঙ্গনের একদিকে রোয়াকের উপর দেব মন্দির উঠিয়াছে, সম্মুখ দিকে একটি পাকা পাক-শালা তাহার ভিতর সারি সারি উনান জ্বলিতেছে, পাশেই ঝুড়ি ঝুড়ি কাটা-কোটা প্রস্তুত আনাজ-কোনাজ, বোধ হয় এখনি রসুই হইবে, —সম্ভবতঃ এই দেব মন্দিরস্থিত দেবকুলের ভোগ ও পরে ব্রাহ্মণ ভোজনের উপকরণ। রোয়াকে উঠিবার সোপানরাজীর এক ধারে জুতা খুলিয়া আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলাম। রোয়াকের উপর একজন পাণ্ডা বসিয়াছিলেন, তিনি আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, আগাইয়া আসিয়া খাতির করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। ভিতরে দালান, দালানের চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডার মত পথ, মার্ব্বেল পাথর মণ্ডিত, সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, নিস্তব্ধ নির্জ্জন, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যেন জৈনদিগের ধর্ম্ম মন্দির। দালানে—দালানের স্তম্ভে, ভিত্তি গাত্রে, খাটালে খাটালে ঠাকুর—কেহ মহাদেব, কেহ গণপতি, কেহ রামচন্দ্রজী, কেহ বুদ্ধদেব অধুনা নামান্তরিত, নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি যেন যোড় বাঙ্গালা--শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তিও রহিয়াছে। আমরা সেই বারাণ্ডা পথে ভিতর দালান প্রদক্ষিণ করিলাম। প্রণামী জমা দিবার জন্য কয়টি বাক্স আছে—ডালায় ফুটা করা, সম্ভবতঃ চাবি বন্ধ। বুঝা গেল এ পাণ্ডাটি পরিচারক মাত্র। আমরা সকল দেবতা প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। রামশিলার সোপানাবলী একজন বঙ্গবাসীর কীর্ত্তিস্তম্ভ জানিয়া গৌরবে স্ফীত বক্ষ হইতে হইতেই বাসাভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

পথিমধ্যে আমরা স্তম্ভশোভিত সুধা ধবলিত একটি সুবৃহৎ খিলান পাইয়াছিলাম; এক সময়ে ইহা বোধ হয় সহরের ফটক স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। খিলানের নীচে দিয়া আসিয়া পথে এক বৃহদাকার সুন্দর মসজিদ

দেখিলাম—ইহাই গযার জুম্মা মসজিদ। পথে এক চৌমাথায় আসিয়া পড়িলাম, নিকটেই প্রায ১৬ ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে, শুনা যায় ইহা মহারাজ অশোকেরই কোন স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ, গয়ার দক্ষিণস্থ বকরৌর গ্রাম হইতে আনিত হইয়া এখানে রক্ষিত হইতেছে. ইহার বেদীতে ফার্সি অক্ষরে কি সব খোদিত আছে। চৌমাথার পূর্ব্বদিকে যে পথ তাহার অল্প দূর যাইলেই ফল্গুনদী। আমরা নদী ধারে গিয়া দেখিলাম গত বৎসরের প্রবল বন্যা তাহার স্মৃতিচিহ্ন প্যাকা কর্দম রাখিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে অপর পারে যাইবার জন্য ফল্গুর উপর একটি কাষ্ঠ সেতু ছিল, বন্যার তোড়ে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিযাছে। সেতুর আর কোন চিহ্ন নাই, থাকিবার মধ্যে আছে ফল্গুর উভয় পারে দীর্ঘ ভিত্তি ভূমি। যেখানে সেতু ছিল,-সেখানে এখন একখানা নৌকা বাঁধা আছে, আবশ্যক হইলে পারাপার করিযা থাকে। সুবিস্তৃত বালুচরের মধ্যে ক্ষীণকায়া ফল্গু—গ্রীষ্মকালে এ কায়াটুকুও থাকে না, বালু খুঁড়িলা ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ষাকালে যখন ঢল্ নামে, অন্তঃসলিলা ফল্গু তখন প্রবল স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে, সমস্ত বালুকাচরকে তলদেশ করিয়া, দুইকূল উপছাইয়া অনেক সময়ে তটবর্ত্তী গ্রাম সহর প্লাবিত করিতে করিতে ধাবিত হয। ভাগ্যের কথা এই জল প্লাবন অধিক দিন স্থায়ী হয় না। তিন চারি দিনের মধ্যেই বেশীর ভাগ জল সরিয়া যায়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই অল্প সময়ের ভিতরেই অবস্থা এমন দাঁড়ায যে তটস্থ জনপদের বাড়ী ঘর জখম হইয়া পড়ে। গয়া সহরেই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। পুরাতন গয়ার অনেক কোঠা, অনেক কাঁচা বাড়ী শোচনীয় অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। শুনা যায়, ফল্গুর বন্যাই কারণ। লুপ্ত সেতুর কিছু দূর উত্তরে রেলওয়ে লৌহপুল দৃষ্ট হয়, ইহার উপর দিয়া E. I Rail কোম্পানীর Grand Chord Line গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন চলিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে ফল্গুর গর্ভ

হইতে একটি ছোট পাহাড় উঠিয়াছিল, তাহার চুড়া চাঁচিয়া সমতল করিয়া তাহাকে এই পুলের আশ্রয় স্তম্ভে পরিণত করা হইয়াছে। পাহাড়টি যেন একটি দ্বীপ, রেলওয়ে পুল মাথায় করিয়া আছে। এই দ্বীপে ছোট একটি মন্দির, ছোট উদ্যান বিরাজ করিতেছে। শুনিয়াছি এখানে কোন যোগী যোগিনীসহ বসবাস করিতেন; এখন কই আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

গয়ায় পিণ্ডদান কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। অনেকে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে এখানে কোথায় কোথায় বেড়াইতে যাওয়া যাইবে। রামশিলা হইয়া গিয়াছে; দক্ষিণ সীমানায় ব্রহ্মযোণী পাহাড়, এইবার সেখানে যাইতে হইবে। একজন বলিলেন, প্রেতশিলাও দেখিয়া আসুন। প্রসঙ্গ ক্রমে কথা উঠিল—যাহাদের অপঘাত মৃত্যু হয়, তাহাদের পিণ্ড প্রেতশিলায় দেওয়া হইয়া থাকে। চড়াৎ করিয়া হৃদয়ের একটা তারে ঘা লাগিল। মনে হইল, তাইত, তাহা হইলে আমার কাজ এখনও বাকি রহিয়াছে। আমাদের বহু পরিবার, নিকট আত্মীয়ের এবং সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে দুই চারি জন আছেন, যাঁহাদের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। এত করিলাম যখন তাঁহাদের কাজও রীতিমত করিয়া যাই। বাসার প্রধান কর্ম্মচারী বাবুকে ডাকাইয়া বলিলাম 'গয়ালী ঠাকুরের ম্যানেজার বাবুকে খবর পাঠাইবেন, আমি কল্য প্রাতে প্রেতশিলায় যাইব, পুরোহিত ঠাকুরকে যেন এখানে পাঠাইয়া দেন।' রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হইল, ভাগ্যে কথাটা উঠিয়াছিল! নইলে এ কর্ম্মটা বাদ পড়িয়া যাইত, চিরদিন মনে একটা আপ্‌শোষ থাকিত। আর যে দ্বিতীয় বার গয়ায় আসিব, সে আশা অল্প। আমার ভাগিনেয়টি—যাঁহার গয়ায় বাড়ী আছে এবং যিনি মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া থাকেন, অপিচ যাহার শৈশব ও কৈশোরের কতক পর্য্যন্ত গয়াতেই অতিবাহিত হইয়াছে,

তিনি বলিলেন,—"এ আপনি বাড়াবাড়ি করিতেছেন, প্রেতশিলায় বেড়াইতে যাইবেন যান, পিণ্ডদান উদ্দেশ্যে সেখানে কোন ভদ্রলোক যায় না। আমি আমার জ্ঞানে কখনও কোন ভদ্রলোককে প্রেত শিলায় পিণ্ড দিতে যাইতে দেখিনাই, কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম, দুপাতা ইংরাজি পড়িয়া আমরা সব নাস্তিকের দল বনিয়া গিয়াছি। জানি, তর্ক করিতে গেলে কেবল খট্‌কা বাড়িবে, মৌন ভাল। যাহা করিবার, চোক কান বুজিয়া করিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কে যেন আমার মাথায় টনক নড়াইয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক খানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আনাইলাম, প্রেতশিলাভিমুখে যাত্রা করা গেল। আত্মীয়টি সঙ্গে চলিলেন। প্রেতশিলা গয়া হইতে পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে রামশিলা পাহাড় প্রায় প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের ছক্র গাড়ী চক্র নাড়ি বক্র পাড়ি মারিয়া এক কর্দ্দমময় যায়গায় উপস্থিত হইল, সেখানে চারিদিকে খোলার ঘর, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন একটা পল্লী, পল্লিবাসী-বাসিনীগণ ঘর কন্নার কাজে এবং কেশ বেশ প্রসাধনে ব্যস্ত, আমাদের গাড়ি সেস্থানে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছে, কারণ সেটা তাহাদেরই অঙ্গিনা। গাড়োয়ান মিঞা পথ ভুল করিয়া একটা ইতর জাতির বস্তির অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, অস্থানে বস্তিবাসীদের তাড়া খাইয়া গাড়ী ঘুরাইয়া আবার সদর রাস্তায় আনিয়া ফেলিল। যাইবার পথে খানিকটা রাস্তা বন্ধুর ও সঙ্কীর্ণ, বোধ হয় মটর কিম্বা ভাল গাড়ী চলিতে পারে না। বেশীর ভাগ পথ পাকা, বেশ প্রশস্ত কিন্তু ধূলি ধূলা কঙ্করে পূর্ণ, আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় গাছ রোপিত, তিন্তিড়ী বৃক্ষ অনেক রাশি রাশি কাঁচা তেঁতুল ফলিয়া রহিয়াছে, দেখিলে রসনা সরস হইয়া উঠে। পথে আমরা পূর্ব্বকথিত রেল ব্রিজের তলা দিয়া গিয়াছিলাম। রামশিলার সন্নিকটে

বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বাগশ্রীর মন্দির, এখানে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অবস্থান করেন। আমাদের নামিয়া দেখিবার সময় হইল না, বেলা হইয়া গিয়াছে, প্রেতশিলায় কাজ আছে।

আমরা নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের তলায় পর্য্যন্ত দেবমন্দির চুণকাম করা পরিষ্কার কক্ষ। গাড়ী হইতে নামিবামাত্র আবার সেই সানাই উৎপাত। মন্দির সীমানার মধ্যে একটা চতুর্দ্দিকে সোপান বদ্ধ চতুষ্কোণ পুষ্করিণী—জল বিশেষ পরিষ্কার নয়, নাম রামকুণ্ড। প্রবাদ রামচন্দ্র এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। রামকুণ্ডের জলে আচমন করিয়া তর্পন করিলাম। পুরোহিত ঠাকুর সঙ্গে করিয়া সেই নীচেকার দেবগৃহের দরদালানে আসিয়া একস্থানে বসাইয়া পিণ্ডদান ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। এখানে আর ১৩২ জনের নাম নহে, পিতৃকুল মাতৃকুল তিন স্তর পর্যন্ত আর আত্মীয় কুটুম্ব যাহাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহাদের নাম গ্রহন পূর্ব্বক পিণ্ড দিতে হয়। এই স্থানে পাণ্ডাদিগকে ১।৵০ দণ্ড ধরিয়া দিলে পর তবে উপরে উঠিয়া প্রেতশিলায় কার্য্য করিবার অধিকার পাওয়া যায়। নীচেকার দেবালয়েও দেবমূর্ত্তি পঞ্চানন, গজানন, আছেন; প্রণামী দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে গেলাম; আসল কাজ করিতে হয় পাহাড়ের চূড়ায়। উঠিবার পাথরে গাথা পাকা সিঁড়ি আছে। কেহ কেহ বলেন এই সোপানবলীও কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির (স্বর্গীয় কৃষ্ণ বসুর) ব্যয়ে নির্ম্মিত। ১৭৭৪ সাল একস্থানে খোদিত আছে। প্রেতশিলা পাহাড়ের শিখরস্থ মন্দির মহারাষ্ট্র রাজ্ঞী স্বনামধন্য অহল্যাবাই কর্ত্তৃকনির্ম্মিত বলিয়াই সকলে জানে। এই পাহাড় উচ্চে ৫৪০ ফুট। রামশিলা অপেক্ষা ১৬৮ ফুট বেশী উচ্চ। ইহার ধাপগুলি ও চড়াই অধিক, বিশেষতঃ শিখরের কাছে বরাবর গ্রাণাইট পাথরের কতকগুলি ধাপ আছে, খুব উচু উচু উঠিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। সেখানে দেখিয়াছিলাম, একটি বৃদ্ধলোক খাটুলি

সাহায্যে এই পাহাড়ে উঠিয়াছে, কিন্তু এই উপরকার সিঁড়ির নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে। অতঃপর চড়াই এত বেশী যে খাটুলী কাঁধে লইয়া উপরে উঠা অসম্ভব। কাহার চারিজন এই পর্য্যন্ত বহিয়া আনিয়া হিম্‌সিম্‌ খাইয়া যান নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। উঠিবার সময় দেখিয়াছি পথে সিঁড়ির পাশে পাশে স্থানে স্থানে ছত্রি খাটাইয়া ছাইভস্ম মাখা জটাজুট ধারী কৌপীনবাস সাধু সন্ন্যাসী আস্তানা গাড়িয়াছেন; কেহ লোকের করকোষ্ঠি বিচার করিতেছেন, কেহ গঞ্জিকা সেবনে রত। যাঁহার জটা খুব বেশী তাঁহাকে আমাদের পুরোহিত ঠাকুর সামান্য কোন প্রশ্ন করিলেন, তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না অথচ তখন তিনি আমাদিগের দিকে চাহিতেছিলেন; একটি লোক তাঁহার চেলাই হউক কিম্বা আমাদের মত কোন যাত্রী হউক তাঁহার গাঁজার কলিকায় আগুন তুলিয়া দিতেছেন। যাহা হউক তিন চারি বার বসিয়া বসিয়া, মধ্যে মধ্যে জিরাইয়া লইয়া, অনেক কষ্টে হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমরা পর্ব্বত চূড়ায় পৌছিলাম। পুরোহিত ঠাকুর পিণ্ডের সরঞ্জাম সঙ্গেই লইয়াছিলেন। শিখর দেশে প্রেত রাজের মন্দির আছে, একটি চাঁদনি আছে, এক প্রকাণ্ড কালো পাথরের চাঁই আছে ছোট মন্দির, ছোট চাঁদনি প্রথমে পিণ্ডদান করিয়া দেব দর্শনাদি করিতে হয়। পিণ্ডদানে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমরা শিখরের এক প্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া লইলাম; আর পাহাড়ের উত্তরদিকে নীচেকার প্রান্তর-রাজির অপূর্ব্ব শোভা এবং তদুপরিস্থিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটীর ও গৃহা-বলীর দূরজনিত আকার-বন্যতা নয়নগোচর করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত ফিট উপর হইতে আমরা দেখিতেছি, সম্মুখে কোন বাধা নাই, দৃষ্টি ছুটিবার আটক নাই, সমস্ত দেশ আমাদের নিম্নে বিস্তৃত, দূরে দূরে জলদ প্রতিম পাহাড়শ্রেণী যেন পৃথিবীর শেষ সীমা। সে দৃশ্য—সে মনোহর দৃশ্য একবার দেখিলে কখনও ভুলা যায় না। আমরা যেখানে

বসিয়াছিলাম, তাহার পাশেই সেই প্রকাণ্ড কালো পাথরের চাঁই কতক অংশে সিন্দুর মণ্ডিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছিল, ঠিক যেন একটা অতিকায় হাতি কি গণ্ডার মুখ হাত পা গুটাইয়া ঘুমাইতেছে। শুনিলাম ইহাই প্রেত শিলা; ইহার জন্যই সমগ্র পাহাড়ের নাম হইয়াছে প্রেতশিলা। ইহার পূজা পরে।

পুরোহিত ঠাকুর ডাকিলেন, পূর্ব্বোক্ত চাঁদনীতে গিয়া আমি দক্ষিণ মুখ হইয়া পিণ্ডদানে বসিলাম। ঠাকুরজী কাগজ দেখিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন আমি বলিয়া যাইতে লাগিলাম। প্রেতশিলায় কার্য্য তাঁহাদের সচরাচর করিতে হয় না, এবং আমার কাছে ফাঁকি চলিবে না তিনি জানিতেন, কোনরূপ ভুল-চুক না হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি লিখিত মন্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছিলেন। কি সুন্দর মন্ত্র।

"অস্মৎ কুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরনর্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

আমাদের বংশে যিনি কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, যাঁহার গতি হয় নাই তাঁহার উদ্ধারের জন্য আমি পিণ্ড দান করিতেছি। এই প্রকার মাতামহকুল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলের উদ্দেশে—অজাতদন্ত, গর্ভে প্রপীড়িত শিশুর পর্য্যন্ত—

"যে যে কুলে লুপ্তপিণ্ডা পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ"

বংশ মধ্যে যাহার যাহার পিণ্ড লোপ হইয়াছে, যে যে পত্নী পুত্রহীন, তাহাদের সকলের উদ্ধার কাজে এই পিণ্ড প্রদত্ত হইতেছে। মহান্! পিতৃ ষোড়শী মন্ত্র, মাতৃ ষোড়শী মন্ত্র কি মনোরম, কি মর্ম্মস্পর্শী! মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। গর্ভাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তানের নিমিত্ত জননী যে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তৎ সমস্ত শ্লোকে শ্লোকে উল্লেখ করিয়া, সেই মাতার সেই গর্ভধারিণীর জন্য, তাঁহার

নিষ্কৃতির উদ্দেশ্যে আমি এই পিণ্ড দান করিতেছি। বলিতে বলিতে আপনাকে ধন্য জ্ঞান হয়। সন্তানের জন্য জননী যাহা করিয়াছেন, যাহা সহিয়াছেন, শ্লোকের পর শ্লোক তাহার ব্যাখ্যান। হৃদয়গ্রাহী মন্ত্ররাজি।—

"দিবা রাত্রে যদা মাতুঃ শোষণশ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমনার্থায় মাতৃ পিণ্ডং দদাম্যহম॥"

দিন নাই, রাত নাই, সদাসর্ব্বদা যে মাতা আমার জন্য আত্মশরীর বার বার শুষ্ক করিয়াছেন, দুঃখে কষ্টে ক্ষয় করিয়াছেন, সেই মাতার উদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই মাতৃপিণ্ড দিতেছি। চমৎকার।

তাহার পর আত্মঘাতাদিগের অপঘাত মৃত্যুতে মৃতদিগের নিষ্কৃতির মন্ত্র সেও মনোহর। সমস্ত নরকের নাম দফায় দফায় ধরিয়া উদ্ধারের মন্ত্র। যে যে প্রকারে আত্মহত্যা হইতে পারে, যে যে প্রকারে অপঘাত মৃত্যু ঘটিতে পারে তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক সেই মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মন্ত্র। তাহাদের নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য আমি এই পিণ্ড দিলাম।

"নরকেস্থ সমস্তেস্থ যাতনাসুচ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরনার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥"

আত্মঘাতীরা বিষম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আমি পিণ্ড দিতেছি, তাহারা উদ্ধার হউক মনে হইতে লাগিল, আমার গয়ায় আসা সার্থক হইয়াছে মনে হইতে লাগিল, সৌভাগ্য আমার কাহারও আপত্তি না শুনিয়া প্রেত শিলায় পিণ্ড দি'ত আসিয়াছিলাম, নহিলে এ মন্ত্র ত শুনিতে পাইতাম না মুখে উচ্চারণ করিতেও পারিতাম না। পিণ্ডদান কার্য্য শেষ করিয়া প্রাণে যে কি স্বস্তি অনুভব করিতে পারিলাম, প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। পরের জন্য যে এটুকু করিতে পারিলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ গৌরব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নিবেদিত পিণ্ডগুলি তাল পাকাইয়া লইয়া

যমরাজকে অর্পন করিতে হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় পরলোকে Pass portর কাজ করে। প্রেত পতিকে পূজা দিলাম, সেইখানকার পাণ্ডারাই মন্ত্র পড়াইলেন; তৎপরে সেই প্রেতশিলা খণ্ডের নিকট আসিয়া দর্শণী দিয়া নমস্কার করিলাম, অপর একজন পাণ্ডা মন্ত্র পড়াইলেন। এক ক্ষেত্রের ভিতর আলাদা আলাদা স্থানে পৃথক পৃথক পাণ্ডা মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন, সেই উদ্ভট ভাষায় মন্ত্র। আমি বাঙ্গালী, আমাকে সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় মন্ত্র পড়ান হইতেছে; জানিনা, অন্য প্রদেশবাসীদিগকে তাহাদের মাতৃ ভাষা মিশ্রিত মন্ত্র পড়ান হয় কি না। প্রেতশিলায় পাণ্ডাদিগকে 'ধামিন্' বলে; ইহারা বোধ হয় কিছু নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণ, গয়ালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইহাদের সংশ্রব নাই। উপরকার সকল কাজ যখন শেষ হইল, তখন 'ব্রাহ্মণ ভোজনের সংকিঞ্চিৎ' জন্য আক্রান্ত হইলাম, সে গোলও চুকাইয়া নামিবার জন্য অগ্রসর হওয়া গেল। চূড়ার নিকটস্থ এই স্বল্প পরিসর উঁচু উঁচু ধাপ কয়টা বিশেষ সাবধানে নামিতে হয়। তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। একটু অসতর্ক হইয়াছিলেন বলিয়া আমার সঙ্গী আত্মীয়টি বেশ একটি আছাড় খাইয়াছিলেন বিলক্ষণ আঘাত পাইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী একটি লোক ধরিয়া ফেলিলেন তাই বেশী দূর গড়াইতে হয় নাই। সোপানাবলী অবতরণ করিতে করিতে বিস্তর কাঙ্গালী ভিখারী জুটিয়া গেল। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। সাধু সন্ন্যাসী গোছ যাঁহারা আছেন, তাঁহারা হাত পাতিয়া কিছু চাহেন না বটে, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ছলে যে সব বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা ভিক্ষারই শোভন সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সোপান পথের আমাদের সেই মৌনী সাধুটি এবার মৌন ভঙ্গ করিয়া কথা কহিলেন। তাঁহার জানিতে বাকী নাই, পাহাড়ে উঠিবার মুখে কেহ কিছু দেয় না, নামিবার সময়েই দর্শণী প্রণামী স্বরূপে যাহাই হউক সেবার জন্য কিছু কিছু দান করিয়া যায়। এবার আমারা

গোপ লইলাম। তিনি কথা কহিলেন; আমরা কেহই কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না; সম্মুখে যেখানে কিছু পয়সা কড়ি জড় করা ছিল, সেখানে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি চলিয়া আসিলাম। প্রেতশিলার পাদদেশে কতকগুলি অপরিপাটি পাথরের চক্র আছে, কেহ কেহ বলে সেগুলি অসভ্য কোল জাতির ধর্ম্ম চক্র, প্রেতশিলা তাদেরই ধর্ম্মক্ষেত্র। আমাদের কল্পিত প্রেত মূর্ত্তির সহিত কোলদিগের সাদৃশ্য সম্বন্ধে অস্বীকার করা চলে না। ভদ্রলোক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে জাতীয় লোক এ অঞ্চলে বেশী আসে না, একথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এখানে পিণ্ডদানের যে মন্ত্র, তাহা উচ্চারণ করিবার জন্য সকলেরই আসা উচিত।

পাহাড়ের নীচে নামিয়া খানিক দূর হাঁটিয়া গিয়া আমাদের গাড়ীতে চড়িতে হইবে। গাড়োয়ান ঘোড়া খুলিয়া দিয়াছিল, সাজ পর্য্যন্ত নামাইয়া রাখিয়াছিল। সাজ চড়াইতে, গাড়ি জুড়িতে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল; সেই সময়টুকুর মধ্যে বিস্তর কাঙ্গালী আসিয়া আমাদের ঘেরিয়া ফেলিল। সাধ্যমত তাহাদের কিছু কিছু দিয়া গাড়ীতে উঠা গেল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সেই কাঙ্গালা সঙ্ঘের অল্পবয়স্ক গুলা—ছেলে মেয়ে দুইই, গাড়ার দুই পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকিল। দুই একবার ছুঁড়িয়া দিয়াছি, পয়সা ফুরাইয়া গেল। গাড়োয়ান ছিপটির ভয় দেখাইতেছে, গ্রাহ্য নাই। পুরোহিত ঠাকুর ধমক দিতেছেন, 'আর কিছু মিলিবে না' বলিতেছেন, কে বা শুনে? ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিজের নিজের পেট চাপড়াইতেছে, অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতেছে, আর গাড়ীর সঙ্গে ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে বেচারাদের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, যদিও রং কালো তবু বুঝা যাইতেছে; রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সেই কাঁকর পাথরকুটিময় পথে ক্রমাগত ছুটিয়াছে। দেখিয়া কষ্ট হইতে লাগিল। দুই একবার 'সকলের জন্য' বলিয়া নিকেলের দুখানি ছুঁড়িয়া দিয়াছি, সে যেখানে পড়িয়াছে, ভূমিতলে কামড়া-কামড়ি

করিয়া যে পাইয়াছে লইয়া পলাইয়াছে, বাকি গুলা আবার ছুটিয়াছে। দেড় দুই মাইল পথ এইরূপ তাহারা কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। ভয় হইতে লাগিল পড়িয়া সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া মরিবে না কি? তাহাদের কাছে হার মানিতে হইল, পথিমধ্যে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। তাহাদের সকলকে ডাকিয়া রাজি করিয়া তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার হাতে সকলের জন্য বাটোয়ারা করিয়া লইতে একটি চৌআনি দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া গেল। পথে এক স্থানে মুসলমানদিগের গোরস্থান এবং খৃষ্টিয়ানদিগের সমাধি ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম, আর দেখিলাম, স্থানান্তরে ভূমি হইতে কিছু উচ্চ, ছাদহীন এক চত্বর, সেখানে কতকগুলি পাড়াগেয়ে স্ত্রীপুরুষকে পিণ্ডদান করান হইতেছে, আমরা চলন্ত গাড়ী হইতে 'পিতৃলোক উদ্ধার হইল' প্রভৃতি মিরজাই আঁটা পুরোহিতের বদন নিঃসৃত মন্ত্র শুনিতে পাইলাম। গয়ার পঞ্চক্রোশের মধ্যে যত্র তত্র বসিয়া শ্রাদ্ধ করা চলে, ইহা বোধ হয় তাহার নমুনা। আবার সেই রেল সেতুর তলদেশ দিয়া আসিয়া, রামশিলা ঘুরিয়া বিশলি গেট পার হইয়া গয়ার উত্তরাংশ সাহেবগঞ্জে প্রবেশ করিলাম। কলিকাতার মেছুয়া বাজার পল্লীর ক্ষুদ্র সংস্করণ একটি চকের মধ্যস্থ পথ ধরিয়া, ক্রমে সহরের বাজার ঘুরিয়া, একটি (Clock Tower) ঘড়ী স্তম্ভের পাশ দিয়া আমাদের গাড়ী ডেরায় আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। পুরোহিত ঠাকুর সেদিনকার দক্ষিণা ও খোরাকি গ্রহণ পূর্ব্বক জানাইয়া গেলেন,—প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিয়া আত্মঘাতীদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মুক্তি হয় নাই; পর দিন তিনি আসিবেন, আবার ফল্গুতে এবং গদাধর পাদপদ্মে তাহাদের পিণ্ড দান করিতে হইবে, তা নহিলে কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাহাই স্বীকার। ম্যানেজার বাবুও পূর্ব্বে ইহার আঁচ্ দিয়াছিলেন। বেশ ত ফের একবার ফল্গু ও বিষ্ণুপদ বেড়াইয়া আসা যাইবে। আত্মীয়দ্বয়কে বলিলাম আবার

যখন ফল্গু যাইতেছি, চল ফল্গু পার হইয়া রামগয়াও বেড়াইয়া আসা যাক সেখানে দশরথের হাতে পিণ্ড আজও রহিয়াছে, দেখা যাইবে। তাহাই মঞ্জুর হইল।

পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় কথা মত পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া দেখা দিলেন, আমি প্রস্তুত ছিলাম, গাড়া আনাইয়া ফল্গুতীর যাত্রা করা গেল। ফল্গুর নিকটে গলি পথের মুখে যে পর্য্যন্ত গাড়ি চলে সেখানে আসিয়া আমরা অবতরণ করিলাম। পুরোহিত ঠাকুরকে বলিলাম, আপনি পিণ্ডের উপকরণ সংগ্রহ করুন, আমরা ফল্গু পার হইয়া একবার রামগয়া ঘুরিয়া আসি। তিনি বলিলেন, "বেশ, একটু তৎপর আসিবেন, আমি নদীতীরে চাঁদনিতে অপেক্ষা করিব।" ফল্গুর কিনারায় আসিয়া পরিধানের কাপড় চোপড় গুটাইয়া আমরা জলে নামিতে আরম্ভ করিলাম। জলে অনেকে স্নান করিতেছে, কেহ কেহ পার হইতেছে, কেহ বা ওপার হইতে এপার আসিতেছে, দেখিয়া আমাদের আর কোন ভয় রহিল না; বিশ্রব্ধ চিত্তে আমরা জল পথে হাঁটিয়া চলিলাম। ক্রমে হাঁটু জল, তারপর হাঁটু ছাড়াইয়া উঠিল। সঙ্গীকে বলিলাম, কি হে ফিরিবে না কি? কাপড় ভিজিবার লক্ষণ যে! তিনি উত্তর করিলেন, 'না, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন, তলায় বালি কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে, সেই সেই স্থানে অগভীর জল, সেই পথ দেখিয়া চলুন।' তাহাই করা গেল। আমার পা তত লম্বা নয়, জলে তবু একটু আধটু কাপড় ভিজিল। যাক্ ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। ডাঙ্গা হইতে নদী—নদীর সমগ্র প্রস্থের কথা বলিতেছি না, কারণ দুই কূলেই অনেকটা করিয়া বালুর চর—জলপ্রণালী যতটা চওড়া মনে হইয়াছিল, চলিতে চলিতে বুঝা গেল প্রস্থ তাহা অপেক্ষা অধিক, পথটি নেহাৎ কম নয়। প্রায় কোয়াটার খানেক সময় হাঁটিয়া আমরা ফল্গু উত্তীর্ণ হইলাম অপর পারের চর কোন কোন স্থানে বেশী প্রশস্ত দেখিলাম

সেখানে গণ্ডা গণ্ডা লোক বসিয়া রহিয়াছে; এক এক বা-দিকে একটি করিয়া পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছে; বালির পিণ্ড দেওয়া হইতেছে। দূর হইতে চরের উপর স্থলে স্থলে যে দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতে সে নোংরা বালি লইয়া আপন জনের পিণ্ড কল্পনা করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। ফল্গুর চরের উপর শবদাহ হইয়া থাকে দেখিলাম। তটের নিকটেই একটি ছোট মন্দির সংলগ্ন রোয়াকের উপর দিয়া আমরা ঠাকুর দর্শন করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একটি কক্ষের মধ্যকার দৃশ্য চমৎকার। কালো পাথর গঠিত মনুষ্য প্রমাণ অপেক্ষা কিছু বড় একটি হাত মেঝিয়াস্থ বেদী হইতে খাড়া উত্থিত হইয়াছে, করতলে ছোট একটি পিণ্ড বা পিণ্ডাকার সেই রংয়ের কিছু বিরাজমান। সে ঘরে অন্য দেবতাও আছেন, দ্বারদেশে ফুলমালা ডালা কিনিতে পাওয়া যায়। আমার ডালা দেওয়া হইল, পূজা দিলাম। এ মন্দিরের—এখানকার পাণ্ডাদের বড় দারিদ্র্য অবস্থা, মনে হইয়াছিল। বাহির হইয়া আমরা চলিয়া যাইতেছি দেখিয়া, দুই তিন জন পাণ্ডা (?) তাহাদের ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত আমাদের ডাকাডাকি করিতে লাগিল 'আরে বাবুজী এ দেওতা দেখিয়ে, ও দেওতা দেখিয়ে, ইধার আইয়ে, দর্শন কি জিয়ে, বাবুজী কো ভাল হোগা।' ইত্যাদি। অল্প স্বল্প দেখিয়া বুঝিলাম, যেখানে যা ভাঙ্গা-চোরা বৌদ্ধ পাথর মূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহাই আনিয়া যা খুসি এক হিন্দু দেবতা বা দেবাবতারের নাম দিয়া খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। দশরথের হাতটিও হয়ত কোন বৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তির ভগ্নাঙ্গ। যাহা হউক, আমরা দশরথের পিণ্ড গ্রহণ দেখিতে আসিয়াছিলাম, দেখা হইয়াছে। ব্যাপারটিতে একটু কবিত্ব আছে সন্দেহ নাই। প্রবাদ সীতাদেবী বনে শ্বশুরের পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, শ্বশুর বধূর ভক্তি প্রদত্ত পিণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আখ্যানটি এই, রামচন্দ্র বন গমন করিয়াছেন, দশরথের মৃত্যু ঘটিল, তাঁহার স্বর্গে যাইবার

তাড়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির কেহ পিণ্ডদান না করিলে স্বর্গে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। তিনি তাড়াতাড়ি বনে রামের কাছে ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন রাম লক্ষ্মণ অনুপস্থিত, সীতা আছেন, তাঁহার আর বিলম্ব করা চলে না, স্বর্গ দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তিনি বধূকে ধরিয়া বসিলেন, "অপেক্ষা করিবার সময় নাই, তুমিই আমার পিণ্ডটা দিয়া দাও।" সীতা দেবী—ফল্গুনদী, একটি বটবৃক্ষ ও আর কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া তণ্ডুলাভাবে বালুর পিণ্ড দিয়াছিলেন। কিন্তু সাক্ষীরা হলফ খেলাপ করিয়াছিলেন—বট তরু ছাড়া। সীতাদেবীর বরে বট হইলেন অক্ষয় বট—শাপে ফল্গু হইলেন বালুলুপ্তদেহা অন্তঃসলিলা। কিন্তু এই আখ্যানের মূল্য কমিয়া যাইতেছে, কারণ অক্ষয়বটও পবিত্র তীর্থ, গয়ার পাদ প্রবাহিণী ফল্গুও অল্প পবিত্র নহে। যাহা হউক রামচন্দ্র বনে উপকরণের অপ্রতুলতা বশতঃ বালু লইয়া পিতৃদেবের পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, আর এখানে আমরা দেখিলাম, গয়ার বিপরীত দিকে, ফল্গুর অপর তীরে বসিয়া লোকে শ্রীরামের অনুকরণ করিতেছে। পিণ্ডের জন্য বালু তুলিয়া তুলিয়া চরের স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ফল্গুর অপর পার হইতে গয়াধামের দৃশ্য কি সুন্দর! অসমতল পাহাড়িয়া জমির উপর গয়ালীদিগের অট্টালিকাবাজি, স্থানে স্থানে নানা মন্দিরের পতাকা শোভিত চূড়া, সকলকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে বিষ্ণু পদ মন্দিরের স্বর্ণকলসমণ্ডিত উচ্চ শিরঃ, কত গৃহ হইতে কত ঘাট স্তরে স্তরে ফল্গুতে নামিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের ও অপরাপর শৈলের জমাট তরঙ্গলীলা মনোহর দৃশ্য।

আমরা আবার হাঁটিয়া পূত সলিলা ফল্গু পার হইয়া গয়া কূলে উপস্থিত হইলাম। পুরোহিত ঠাকুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি আসিতেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রেতশিলায় যাঁহাদের যাঁহাদের নামে পিণ্ডদান করা হইয়াছে, এবার ঠিক তাঁহাদের নামেই পিণ্ড প্রদত্ত হইল। অবশ্য পিতৃ-

কুলেব ও মাতৃকুলেব তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই পিণ্ডদান কার্য্যে মুখপাত স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। ফল্গুতীবেব কাজ সমাপন কবিয়া, নদীধাবেব পথ ধবিয়াই আমবা বিষ্ণুপদমন্দিব আয়তনেব মধ্যে প্রবেশ কবিলাম। যদিও সেদিনকাব মত এ দিনও দুয়াব বন্ধেব দক্ষিণা দিতে হইল এবং সাধাবণ লোককে মন্দিব প্রকোষ্ঠেব দ্বাবদেশে আটক কবাও হইয়াছিল, এদিন আব তত ভিড় ছিলনা। প্রথমকাব সেদিন ছিল পার্ব্বণ অমাবস্যা, শ্যামা পূজাব তাবিখ, বিস্তব লোক শ্রাদ্ধ তর্পণ কবিতে আসিয়াছিল। এদিন বিষ্ণুপদ বক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আট দশটি মাত্র লোক ভিতবে, বেদীব পাড়েব কাছে বসিবাব যথেষ্ট যায়গা আছে ঠেসাঠেসি নাই। পুবোহিত ঠাকুব পাশে বসিয়া খেই ধবাইয়া দিতে লাগিলেন, আমি মন্ত্র পড়িয়া যাইতে লাগিলাম, গদাধব পাদপদ্মেব উপব নামে নামে পিণ্ড ছুঁড়িয়া দিলাম। পিণ্ডদান কার্য্য শেষ হইলে, সেখানকাব একজন পাণ্ডা, শুনিলাম গয়ালী বংশীয় সুশ্রী সুপুরুষ গবদেব জোড় পরিহিত চন্দনেব কৌটা ধাবী, অগ্রসব হইয়া আমাব পাশে বসিলেন; আমাব হাতে ফুল তুলসী দিয়া গয়া ক্ষেত্রে গয়াশিবে বিষ্ণু পাদপদ্মে সেই হস্ত স্পর্শ কবাইয়া মন্ত্র পড়াইলেন; এ কাজটা প্রথম দিন অত ভিড়েব মাঝে হইয়া উঠে নাই। প্রণাম হইয়া গেলেপব, তাঁহাদেব মুখে ও সেই বাঁধা বুলী ব্রাহ্মণ ভোজনেব জন্য যৎকিঞ্চিৎ যথা ইচ্ছা নহে—যথা সাধ্য, যথা সামর্থ্য যেন প্রদান কবা হয়। পুবোহিত ঠাকুবেব হাত দিয়া, যাহা দিবাব দিলাম। এখানকাব কবণীয় সমস্ত সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয়বাব অক্ষয় বট যাইবার প্রয়োজন হয় না, ইহাতে ত 'সুফল' বলাই নাই। গয়ালী প্রভুদের কথা অনেক শুনিয়াছি; গয়ালীব পা পূজা করিব না, সুফল চাহি না, একথা গয়া আসিবাব পূর্ব্বে বাটিতে আমাব গুরুস্থানীয় কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে বলিয়াছিলাম। তিনি বুঝাইয়া

ছিলেন গোঁয়ারতমি করিবে না; শাস্ত্রে আছে গয়ালীরা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন আমরা যে নিষ্ঠাচারী অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আমরা পর্য্যন্ত তাহাদের চরণ পূজা বাদ দিই না, আমরাও তাহাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করি।" অগত্যা ঘাড় পাতিয়াছি। পাছে পিণ্ডদানক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইয়া যায় এই ভয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধারণ মনুষ্যে দেবত্ব আরোপ করিয়াছি। যাহা হউক, এবার সে দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে। প্রেতশিলার কল্যাণে ফল্গু তীর্থে বিষ্ণু পাদপদ্মে দুইবার করিয়া পিতৃকুলের, মাতামহকুলের পিণ্ডদান করিতে পাইলাম বলিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। পুরোহিত ঠাকুরকে খুসি করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গয়ার উত্তরভাগে যেমন রামশিলা, দক্ষিণভাগে তেমনি ব্রহ্মযোনি বা গযাশীর্ষ। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থ ললিত বিস্তরে আছে,—'গয়াবাসীগণের নিমন্ত্রণে ভগবান শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে গয়াধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং বোধগয়ায় প্রয়াণের পূর্ব্বে কিযৎকাল গয়াশীর্ষ শিখরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেন; বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই স্থানেই প্রথমে তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

ব্রহ্মযোনি পাহাড় সমতলভূমি হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চ। উপরে উঠিবার পথ পর্ব্বতগাত্র দিয়াও আছে, সোপানাবলী সাহায্যেও আছে। প্রস্তরের গাথনি সোপান তলদেশ হইতে পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া গিয়াছে—প্রশস্ত ধাপ। সোপান গাত্রে খোদিত রহিয়াছে,—যাত্রীগণের সুবিধার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় দেবরাও ভাও সাহেব কর্ত্তৃক কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হয়। এবার আমি একা, সঙ্গে কেহ নাই। সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি, দেখিলাম কতকগুলি স্ত্রীলোক বাঙ্গালিনী উপর হইতে নামিয়া

আসিতেছেন। আরোহণের পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া আমি ধাপের এক কোণ হইতে উপরে অপর কোণের দিকে তির্য্যকভাবে আরোহণ করিতেছি, দেখিয়া তাহারা অনুমান করিলেন, আমি হয়ত দু'চার ধাপ না উঠিতে উঠিতেই হাঁফাইয়া গিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—'কেন যাচ্চ বাবা, পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যাবে।' স্ত্রীজাতি সততই পরদুঃখকাতরা, তাঁহার বাৎসল্যের উত্তরে আমি বলিলাম,—'তোমরা পারিলে মা আর আমি পুরুষ মানুষ হইয়া পারিব না?' কথাটা বলিতে বলিতে আমি উঠিয়া গেলাম, তাঁহাদের মধ্যে একটা নবীনা সামান্য কিছু রহস্যের কথা প্রত্যুত্তর স্বরূপ বলিয়া থাকিবেন, আমি ভাল শুনিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার দলের সকলে হাসিয়া উঠিলেন দেখিলাম, আন্দাজে সিদ্ধান্ত করিলাম, অবশ্য মুখের মত জবাব হইয়া থাকিবে। উঠিয়াছি, ক্রমাগত উঠিতেছি মধ্যে মধ্যে চাতাল আছে, বসিয়া বিশ্রাম করা চলে, এক একবার জিরাইয়া লইতেছি। উঠিতে উঠিতে যখন হাঁফাইয়া গিয়াছি, দেখিতে পাইলাম, কিছু উপরে ধবধবে সাদা ছোট একটী কোঠার মত কি দেখা যাইতেছে। ভাবিলাম ঐ ত মন্দির, আর কি, আসিয়া পড়িয়াছি। নিকটে গিয়া দেখি সেটি মন্দির নয়, পথের মাঝে সিঁড়ির উপর ছোট একটা চাঁদনী। বোধ হয় যাত্রীগণের বিশ্রাম স্থান, ভিতরে তাহার দুই পাশে রোয়াক আছে, ধূলায় পরিপূর্ণ। একদিককার রোয়ায়েক উপর একটী মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সিন্দূরমণ্ডিত ফুল চন্দনের অভাব নাহি। কাছে পাণ্ডা আছে, ফিরিবার সময় পূজা দিব বলিয়া অগ্রসর হইলাম। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্নে পথে আর এক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম—একটু অদ্ভুত বলা চলে। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। সিঁড়ির বাহিরে, চাতালের পাশে, পাহাড়ের গায়ের উপর একটী মানুষ শুইয়া আছে, একেবারে বালুতে নিমজ্জিত হইয়া,—ভস্মমাখা রুদ্রাক্ষমাল্য জড়িত দক্ষিণ হস্তটি মাত্র কফোণি

হইতে উন্নত অবস্থায় বাহির হইয়াছে। পাশেই চাতালের উপর একটা লোক বসিয়া আছে, বোধ হয় চেলা-টেলা হইবে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার হাতে ডুগির মত একটা বাজনা, যদিও তখন সেটা বাজাইতেছিল না, সম্ভবতঃ মধ্যে মধ্যে বাজায়। সেই লোকটাই পরিচয় দিতেছে—মহাত্মা সাধু আজন্মকাল এখানে বালুরাশি মধ্যে যোগমগ্ন। 'সেবা কুছ্ মিলে।' তখন আর আমি অপেক্ষা না করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে উপরে উঠিয়া গেলাম, ভাবিতে লাগিলাম, লোকটার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিছে কি প্রকারে? পা ধরিয়া আসিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে উরতে লাগিতেছে, এতক্ষণে উপরে উঠিতে বেগ পাইতে হইতেছে। নীচে যে স্ত্রীলোকগুলির নিকট গর্ব্ব করিয়া আসিলাম, এইবার দর্প চূর্ণ হয় বুঝি। আর উঠিতে পারিতেছি না। উপর পানে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, অল্প পথ উপরেই একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক সিঁড়ির ধারে একা বসিয়া আছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল কোন যাত্রীই হইবে, বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আমি নিকটে আসিতে সে হিন্দী ভাষায় ব্যক্ত করিল—'এদিকে আসুন বাবু, দর্শন করুন এই ব্রহ্মযোনি।' শুনিয়া একটু চকিত হইলাম, তখনও অনেক ধাপ উপর দিকে চলিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। ব্যাপার কি? নিকটে যাইয়া দেখিলাম, সিঁড়ির বাহির পাশে পাহাড়ের গায়ে বিবরের মুখ মত খানিকটা ফাক—কোণ বিশিষ্ট গর্ত্ত, তাহার ভিতরটা যতদূর দেখা যায়, সিন্দুর রাঙ্গা করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাই যাত্রীদের দেখাইয়া প্রণামী আদায় করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে—পরিচয় দিতেছে জনৈক স্ত্রীলোক। রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল, বাক্য ব্যয় না করিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। আর বেশী দূর নয়, সিঁড়ি হইতে উপরে মন্দিরের সীমানা প্রাচীর দেখা যাইতে লাগিল। ছাদের আলিসার মত প্রাচীরের ধারে বাহিরে জুতা, মোজা খুলিয়া, মন্দির এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রশস্ত প্রাঙ্গন—

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের শিখরদেশ। তাহার পূর্ব্বদিকে একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রকায় মন্দির—তন্মধ্যে ব্রহ্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। উপস্থিত পাণ্ডাদের একজন মূর্ত্তির কপালস্থ সিন্দুর লইয়া আমার কপালে ফোঁটা দিয়াছিলেন। মন্ত্র পড়ান হইল, আমি প্রণামী দিলাম। মূর্ত্তির ললাটে বেশ ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিত দেখিয়া আমি বাড়ীর জন্য খানিকটা সেই সিন্দুর চাহিলাম; আনন্দের সহিত পাণ্ডা ঠাকুর পাতায় মুড়িয়া অনেকটা প্রসাদী সিন্দুর আমার হাতে দিলেন। ব্রহ্মশক্তির পাশে আরও কি কি মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী মূর্ত্তি কাহারও কাহারও মতে জৈন তীর্থঙ্কর শম্ভুনাথ, তাহার পাদপীঠে অশ্বের প্রতিকৃতি খোদিত—এখানে অবশ্য হিন্দুদেবতা বলিয়াই পরিচয় প্রদত্ত হয়। এখানে পঞ্চানন মূর্ত্তিও বিরাজমান, নাম শুনিলাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মাশক্তির সহিত সম্পর্ক রাখিতেই বুঝি পঞ্চানন চতুর্ম্মুখের আখ্যা পাইয়াছেন। প্রাঙ্গনে হরপার্ব্বতী ও মহাদেবের ষণ্ডের প্রতিমূর্ত্তিও আছে! দেবতাদের দর্শন করা হইল। আর একজন পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া আমাকে প্রাঙ্গনের ঠিক অপর সীমানার পশ্চিম দিকে লইয়া গেলেন। সীমানার সেই প্রাচীর আলিসা কাটিয়া সেখানে একটী পাথর আছে, সেইটী ডিঙ্গাইয়া আমরা পাহাড়ের মাথায় স্বাভাবিক ভূমিতে নামিলাম। সেই স্থলে কিছু নিম্নে এক প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখা গেল; তাহার বয়স শুনিলাম কয় লক্ষ বৎসর বা আমাদের এই পৃথিবীর সহিত সেটি সমবয়স্ক। তেঁতুলতলা দিয়া কিছু পথ নামিয়া, আমরা এখন এক স্থানে উপস্থিত হইলাম, যেখানে এই পাহাড়ের গোটাকতক চাঁই পাথর এলোমেলো ভাবে ঠেকাঠেকি হইয়া অবস্থিত আছে; মধ্যে একটু ফাঁক, সেই ফাঁকের অবকাশ দিয়া অপর পার্শ্ব বেশ দেখা যায়; সেই অবকাশ বা ছিদ্রটুকু লম্বা ও পাতলা, প্রশস্ত নহে, অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে, খাড়াই নাই। পাণ্ডাজী বলিলেন, ইহার ভিতর দিয়া গলিয়া অপর পার্শ্বে যাইতে হইবে। ছিদ্রটির

পরিসর দেখিয়া, তাহার মধ্য দিয়া মানুষ গলিতে পারে, এমন মনে হইল না। আলিসার উপর হইতে অন্যান্য পাণ্ডা ও যাত্রীরা তামাসা দেখিতেছিলেন। আমিও ঘামিতে আরম্ভ করিলাম, ভাবিলাম—'মু ত পারিমু না অবধড়।' পাণ্ডাজী হাস্যমুখে কহিলেন, 'এই দেখুন'—বলিয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া তিনি সেই ছিদ্রপথে গলিয়া সড়াক্ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমিত অবাক্। তাঁহার শরীর আয়তনে আমার অপেক্ষা অধিক বই অল্প নয়। সাফল্য দেখিয়া আমারও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। চীৎ হইয়া শুইয়া কনুইয়ের উপর ভর দিয়া গলিতে গেলাম; স্থান এত অপরিসর বা পাতলা যে একটু কাৎ হইতেই নাকের চশমা ও উরুর উপরটা আটকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। পাণ্ডা পরামর্শ দিলেন—ঈষৎ নামিয়া যান, আর একটু তলার দিকে পা আগাইয়া দিন। পায়ের তলার দিকে অল্প যায়গা ছিল; শুইয়া শুইয়া কিঞ্চিৎ হটিয়া যাইবার পর, সে ছিদ্র পথ উত্তীর্ণ হইলাম। লিখিতে যতটা সময় লাগিল, গলিয়া যাইতে ততক্ষণ লাগে নাই। যখন পার হইয়া গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন পাণ্ডাজী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'আপনার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া গেল বাবুজী, গর্ভ যন্ত্রণার দায় এড়াইলেন, পুনর্জ্জন্ম গ্রহন করিতে হইবে না। আপনি ব্রহ্মযোনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন।' সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন,—'এখন দুগ্ধ মিষ্টান্নের মূল্য ধরিয়া দিন।' সেইটাই না আসল কথা! কত দুধ চাই জিজ্ঞাসা করাতে কয় মণ, কয় সের বলিয়াছিলেন, ভুলিয়া গিয়াছি। মূল্য স্বরূপ যা হউক কিছু দেওয়া গেল। শুনিসাম যাঁহাদের শরীরে পাপ আছে, তাঁহারা আটকাইয়া যান, এ গর্ত্ত পথে গলিয়া যাইতে পাবেন না। মোটা মানুষের সাধ্য নাই যে এই সঙ্কীর্ণ ছিদ্র মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে কি ধরিতে হইবে স্থূলকায় মনুষ্য মাত্রই পাপী, তাহাদের পাপ ক্ষয় হয় না? আর কৃশ দেহ হইলেই পুণ্যের জাহাজ? যাক্—আমরা অগ্রসর

হইয়া উঠিয়া ভিন্ন স্থলে আবার আলিসা ডিঙ্গাইয়া মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। বরাবর পাহাড়ে সিদ্ধনাথ মন্দিরে যেমন লক্ষ্য করিয়াছিলাম এখানেও দেখিলাম তাই। যিনি মন্ত্র পড়াইযাছিলেন, তিনি বিনীতভাবে বলিলেন,—'বাবুজী হাম্‌কো ভি কুছ মিল্ যায়।' আমি যখন জানাইলাম, দেবতার আসনে ত প্রণামী জমা দিয়াছি। উত্তর হইল,—সে সব অপরের পাপ্য—'পাণ্ডাজী কো ঠাকুর।' বুঝা গেল ঠাকুরের অধিকারী অপর তাঁহাকেও কিছু দিয়া আমি নামিতে অগ্রসর হইলাম। এ ব্রাহ্মণটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন; বলিলেন, ব্রহ্মকুণ্ড দেখাইয়া দিব। ভাল কথা, কতক পথ নামিয়া, দেখিলাম, সিঁড়ির পাশে একটু দূরে পাহাড় যেখানে নামিয়া গিয়াছে, সেইখানে পাহাড়ের ঢালু গায়ে বৃহৎ গর্ত্ত মত একটা জলাশয় রহিযাছে। জল তখন অনেক নীচে, সবুজবর্ণ পানা ভরা। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'ঐ জল স্পর্শ করা কর্ত্তব্য। নামিবার পথ দুর্গম, সেখানে নামে কে? আমাকে ইতঃস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,— 'আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন, আমি ঐ পূতবারি আনিয়া দিতেছি।' পাহাড়ের গা দিযা বুঝি সরু সরু ধাপের মত খাঁজ কাটা পথ আছে, তিনি তড়বড় করিয়া নামিয়া গিয়া করপুটে জল লইয়া আসিলেন। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আমার সর্ব্বাঙ্গে ছিটা দিয়া দিলেন। ব্রহ্মকুণ্ড জলে আমার স্পর্শ স্নান হইয়া গেল। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে ব্রহ্মকুণ্ড আছে, কিন্তু রামশিলায় রামকুণ্ড নাই, রামকুণ্ড আছে প্রেতশিলায়—তলদেশে।

আমি সোপান বাহিয়া নামিয়া আসিতে লাগিলাম। সিন্দুরমণ্ডিত হনুমানজীর পূজা দিয়া, সেই বালুনিমগ্ন সাধুর সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি সেই একই অবস্থায় রহিয়াছেন; হাতটি শুধু জাগিয়া আছে। তাঁহার চারিপাশে বালুরাশির উপর ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলাম, কই নিশ্বাসের জন্য বায়ু সঞ্চালনের কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ব্যাপার

কি বুঝা গেল না। এক মুঠা পয়সা তাহার সেই উদ্ধোত্থিত করতলে রাখিয়া দিলাম; অন্য কোন লক্ষণ দেখিলাম না, কেবল আশীর্ব্বাদের উদ্দেশে হস্ত যেন ঈষৎ কম্পিত হইল। আমার নিকট ইহা এক রহস্য রহিয়া গেল। একেবারে যে অলৌকিক কাণ্ড, মনে হয় নাই; তাহা যদি হইত, ঝুলিধারী চেলার সঙ্গে থাকিবে কেন? তবে নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে লোকটির অসাধারণ ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। বাসায় আসিয়া বন্ধুগণের কাছে এ বিষয় উল্লেখ করিলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, বালির মধ্য দিয়া পাইপ আছে নাশারন্ধ্রের সহিত তাহার যোগ বর্ত্তমান, তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। যাহা হউক, তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

সোপানাবলীতে যত্র তত্র কাণা অন্ধ খঞ্জ কাঙ্গালী ভিখারী অনেক ছিল। ইহাদের ভিতর জুয়াচোরেরও অভাব নাই। একটা অন্ধকে সাজস্ টের পাইয়াছিলাম; অল্প বয়স্কেরা কেহ কেহ পয়সা পাইয়া ছুটিয়া নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে; কিছু পরে সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বাঁক ফিরিয়া দেখি অপরের সঙ্গে তাহারাও আবার হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ধরিয়া ফেলিলে সে কান্না, সে শপথ পূর্ব্বক অস্বীকারের ধুম দেখে কে? সকলকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া তলদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম, একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক, উপরকার সেইটাও হইতে পারে নিকটে আসিয়া বলিল, 'আসুন বাবুজী, সুভদ্রা মায়ী দর্শন করিয়া যাইবেন।' তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের তলায় এক দেবালয়ে প্রবেশ করা গেল। অন্ধকার ছোট কুঠরী তাহার মধ্যে সুভদ্রা দেবী আছেন, আরও কে কে আছেন, দর্শনী দিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

ব্রহ্মযোণী পাহাড়ের অপর দিকে অনুন্নত এক শৃঙ্গের উপর শক্তি দেবী মঙ্গলাগৌরীর পীঠ। এখানে বহু ভক্ত, অবশ্য শাক্ত সম্প্রদায় বিস্তর পাঁঠা

বলি দিয়া থাকেন। শুনিয়াছি শারদীয়া পূজার সময় এই পীঠস্থান রক্তে ভাসিয়া যায়। গদাধর পাদপদ্মের এবং বিষ্ণু মণ্ডপের এত সন্নিকটে, এই বৈষ্ণব প্রধান স্থানেও রক্ত ছড়াছড়ি বিসদৃশ মনে হয়। কিন্তু ইহাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, দেশে সর্ব্বত্রই তান্ত্রিকদিগের অধিকার বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। পুরীতে জগন্নাথ দেবের এলাকার ভিতরেও বিমলা দেবীর মন্দির জীবরক্ত কলুষিত।

আমরা পথে আসিতে আসিতে গাড়ী হইতে দেখিয়াছি, এই ব্রহ্মযোনি অপর এক শৃঙ্গের উপর সহরের জল সরবরাহ ট্যাঙ্ক বা সুবৃহৎ জলাধার স্থাপিত; অত উপর হইতে জল নামিয়া আসে বলিয়াই গয়াতে দোতালা তেতালায় কলের জলের অমন তোড়।

গয়াসহর এখন প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তরে সাহেবগঞ্জ ইহার ভিতর আপিস আদালত কাছারী বাজার সাহেবদের মোকাম দোকান স্কুল হাস্পাতাল ডাক্তারখানা গির্জ্জা মসজিদ ময়দান লাইব্রেরী প্রভৃতি, ইহার পথ ঘাট পরিষ্কার, বেশ চওড়া চওড়া সুবিন্যস্ত রাস্তা চৌরাস্তা, নূতন নূতন অনেক বাড়ী ইমারত নির্ম্মিত হইয়া সহরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে জেল, সাহেবদের ঘোড়াদৌড়ের মাঠ গল্‌ফ খেলিবার আয়তন (Golf Links) প্রায় ব্রহ্মযোনির নীচেই তাহার নিকট বর্ত্তী স্থানকে বলে 'গাই বাছোয়া'; এখানে স্তন্যপান রত বাছুর সহিত একটি গাভীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, ইহা বোধ হয় নামের ব্যুৎপত্তি। সহরের দক্ষিণ ভাগ পুরাতন গয়া, ইহার মধ্যে তীর্থ মন্দির দেবালয় দেবস্থান মণ্ডপ চত্তর, সমৃদ্ধিশালী গয়ালীগণের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, কোন কোন বাটীর দেয়াল যেন কেল্লার প্রাকার! যাত্রীগণের থাকিবার কোঠা, পুরাতন ভগ্ন জীর্ণ পতিত পতনোন্মুখ পরিত্যাক্ত বহু ইমারত, অসমতল অপ্রশস্ত পাহাড়িয়া পথঘাট সরু সরু অর্দ্ধ অন্ধকার দুর্গন্ধময় অলি গলি গোলক ধাঁদা বিশেষ।

তাহার মধ্যে দোকান-পাট মিষ্টান্নাদির পর্য্যন্ত মাছি ও বোলতার একাধিপত্য। পুরাতন গয়ার উত্তরাংশে রায় বাহাদুর সূর্য্যমল্ল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার নব নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সুদৃশ্য ধর্ম্মশালা, ইহাই বোধ হয় সমগ্র গয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমারত।

গয়া ধামের উত্তর সীমা রামশীলা পাহাড়, দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পাহাড়, পূর্ব্বে ফল্গু নদী, পশ্চিমে বিশাল প্রান্তর ও পরে কাঠারিয়া পহাড়। সমগ্র গয়া সহর পর্ব্বতমালার এক উপত্যকা বলিলে চলে। গয়ায় মন্দির দেবালয় বিস্তর। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন ইদানীং গয়াতে বেশী পুরাতন ইমারত নাই, এখনকার দেবস্থান মন্দিরাদির অধিকাংশ পুরাতন ভিত্তিয়, স্থানান্তরে পুরাতন মাল মশলা লইয়া, নূতন করিয়া নির্ম্মিত। হিন্দু ধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বহু মূর্ত্তি প্রায় সমস্তই কালো Granite প্রস্তরে গঠিত, পুরাতন গয়া যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাদির ভিত্তিতে সংলগ্ন প্রাঙ্গন প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে স্থাপিত কত যে মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এ সকলের মধ্যে কোন্‌টি বৌদ্ধ কোন্‌টি হিন্দু মূর্ত্তি এমন নির্দ্ধারণ করা অনেক স্থলে কঠিন।

বিষ্ণুপদ মন্দিরই গয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বিষ্ণু পদ মন্দিরের আশে পাশে কত যে দেবস্থান, দেব দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, সকল গুলি আমরা দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। সন্নিধানে অপর একটি প্রাঙ্গনে গয়েশ্বরী দেবী ও গদাপাণী শ্রীবিষ্ণুর মণ্ডপ আছে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রস্তর গঠিত ক্ষুদ্রকায় মন্দির। এই প্রাঙ্গনের উত্তর পশ্চিম কোণের নিকটে একটি ছোট প্রস্তর স্তম্ভ আছে, তাহার সহিত এক হস্তিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ, উভয়েরই গঠন পরিপাট্য বিহীন; ইহার অভিধা ‘গজ’ জনপ্রবাদ, এই গজস্তম্ভ হইতে পঞ্চক্রোশী গয়াতীর্থের পবিত্র পঞ্চ ক্রোশের পরিমাণ গৃহিত হইয়া থাকে। ফটকের সমীপে পথে করী যুগল বাহিত সিংহাসনে আসীন

দেবরাজ ইন্দ্রের একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, বেশ সুন্দর। বিষ্ণুপদ মন্দির পৌঁছাইবার রাস্তায় ছোট একটি দেবালয় তন্মধ্যে মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। একটি হস্তী কোন বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িতেছে, মূর্ত্তিটি বহু প্রাচীন বলিয়া কথিত আছে। একটি সূর্য্য মন্দিরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকটে ব্রহ্মণীঘাটে আর একটি মণ্ডপ আছে, তাহার উপর বৃহদাকার এক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিস্থাপিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট অনেকগুলি দেবালয় বিরাজমান, দেখিতে তেমন জমকাল না হইলেও তাহাদের নাম ডাক সামান্য নহে।

গয়াধামে এত দেবমন্দির দেব মূর্ত্তি আছে ইহার মধ্যে অধিকাংশ মহাদেব বা মহেশ্বর– সকলই লিঙ্গ মূর্ত্তি। আমাদের বাসার সন্নিকটে প্রতি সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া আরতি কাঁশর ঘণ্টার আওয়াজ পাইতাম, এক দিন যাইয়া দেখিয়া আসিলাম, শিবলিঙ্গ নাম 'পিতা মহেশ্বর'। নিকটেই পূর্ব্ব দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এক জলাশয় রহিয়াছে উদ্ভিজ্জ পূর্ণ, নাম শুনিলাম 'মানস সরোবর।' এটি দক্ষিণ মানস। অক্ষয় বট প্রাঙ্গনের নিকটে একটি প্রস্তর গঠিত মন্দির আছে, অধিষ্ঠিত দেবতার নাম 'প্রপিতামহেশ্বর।' এমন কত মহেশ্বর আছেন। গয়ায় বিষ্ণু মন্দির আছে, আবার 'কৃষ্ণ দ্বারকা' মন্দিরও আছে; 'নরসিংহ' মন্দিরও রহিয়াছে। কৃষ্ণ দ্বারকা মধ্যে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, নিকটে রুক্মিণী কুণ্ড দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে শিতলা মন্দির ও বিদ্যমান। ভবেশ নামে আর একটি শিবের মন্দির উল্লেখ যোগ্য।

প্রায় শত বৎসর হইল, দামোদর লাল ধোক্রী কর্ত্তৃক বর্ত্তমান কৃষ্ণদ্বারকা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ শিলালিপির সাহায্যে সাব্যস্ত করিয়াছেন, আধুনিক কৃষ্ণ দ্বারকা মন্দির ও নরসিংহ মন্দির যথাক্রমে প্রাচীন বিশ্বাদিত্য নির্ম্মিত বিষ্ণু মন্দিরের এবং বিশ্বরূপ নির্ম্মিত গদাধর মন্দিরের উপাদানে গঠিত। একখানি শিলা লিপিতে বিশ্বাদিত্য কর্ত্তৃক ভবেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামে দুইটি শিব মন্দির নির্ম্মাণের উল্লেখ আছে।

শীতলা মন্দিরের একখানি লিপিতে বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপাল কর্ত্তৃক বহু দেবতার উদ্দেশে একটি মন্দির নির্ম্মাণের ও উত্তর মানস নামে একটি সরোবর খননের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বাদিত্য ও বিশ্বরূপ গয়ার প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন কোন বংশের সন্তান, বাঙ্গালার অধীশ্বর পাল বংশীয় নরপাল বিগ্রহ পালের সমসাময়িক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক। ইহা হইতে বুঝা যায়, কেন পুরাবিদেরা বলেন, গয়ার এখনকার অনেক মন্দির পুরাতন ভিটায় পুরাতন মাল মশলায় নূতন করিয়া নির্ম্মিত। গয়ার অনেক স্থাপত্য পাল রাজাগণের আমলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাম গয়ায় মহিপাল দেবের একখানি শিলা লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গয়া নামের উৎপত্তি গয় অসুর হইতে। গয় অসুর বড় মাতব্বর অসুর ছিল। মার্ ধরে নয়, অত্যাচার অনাচারে নয়, উগ্র তপস্যার জোরে দেবতাদিগকে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেবতারা কৌশলে বশ করিয়া তাহার গায়ের উপর বসিয়া যজ্ঞ করেন, কিন্তু তবু তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহারা যাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু গয়াসুরের নিকট আসিলেন, বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া গয় তাঁহার চরণে প্রণত হইল, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তাহার মাথার উপর একখানি পাথর চাপা দিয়া পা তুলিয়া দিলেন। পাথর খানি 'ধর্ম্মশিলা'। আদেশ করিলেন, 'অমনি ভাবে থাক।' গয়াসুর উত্তর করিল 'আচ্ছা আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া থাকিতে রাজি আছি, কিন্তু হে ঠাকুর বর দাও আমার শরীর যত দূর বিস্তৃত রহিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত স্থান গয়া ক্ষেত্র নামে অদ্বিতীয় তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর এই তীর্থে বসিয়া কেহ শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, তাহার পূর্ব্বপুরুষাদি বৈকুণ্ঠে যাইবে। বিষ্ণু বলিলেন 'তথাস্তু।' সেই অবধি যেখানে বিষ্ণুপদ মন্দির উঠিয়াছে, সেই স্থানে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের নিম্নে গয়াসুরের শিরঃ বিরাজ করিতেছে, আর

তাহার শরীর ছিল পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া, এই পঞ্চ ক্রোশ মহাতীর্থ; এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যেখানে হউক বসিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে, গয়া শ্রাদ্ধের ফল পাওয়া যায়, শ্রাদ্ধ কর্ত্তার আত্মীয় স্বজন উদ্ধার হইয়া যান, বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। ইহা হইল পৌরাণিক আখ্যান।

পঞ্চ ক্রোশী গয়া মধ্যে ইস্তক প্রেতশিলা নাগাইদ বোধগয়া পর্য্যন্ত চল্লিশটি বেদী আছে। কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমস্ত বেদী দর্শন করিয়া, সকল স্থানেই পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। ইহাকে চলিত ভাষায় 'খাপবেল গয়া' কৃত্য বলে।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন, গয়ার বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ চিহ্ন ব্যতীত কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইলেন, বুদ্ধপদকে বিষ্ণুপদে পরিণত করিলেন। চরণ পূজা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যেই প্রবল।

বৌদ্ধেরা কহেন,—গয়া নাম উৎপন্ন হইয়াছে প্রসিদ্ধ অগ্নি উপাসক গয় কাশ্যপ হইতে। ইঁহাকে বুদ্ধদেব এই স্থানে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ স্থানটির 'গয়া' নামকরণ হইয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যাবিশারদ সুধীগণ গয়াসুর ও বিষ্ণুপদ আখ্যান সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অর্থের ঘাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন, গয়াসুর হইতেছেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বিষ্ণুপদ হইতেছেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত, বশীকৃত, পদ-দলিত, তন্নিমিত্ত গয়াসুর বুদ্ধ বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিরোদেশে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বিরাজিত।

পঞ্চক্রোশী গয়ার দক্ষিণ সীমা বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়া যাইবার কল্পনা ছিল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গয়ালী ঠাকুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার মোটর পাঠাইয়া

ছিলেন, তাহাতে চাপিয়া বুদ্ধগয়ায় ( স্থানীয় নাম বোধ গয়া বা মহাবোধি ) যাওয়া গেল। বদ্ধগয়া গয়া তীর্থ হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বেশ পাকা শড়ক্ আছে, দুই ধারে বৃক্ষ শোভিত, ইহার মধ্যে মৌ বা মহুয়া গাছ প্রচুর। একটু তফাতে ফল্গু বা নৈরাঞ্জনা ( নীরাঞ্জনা বা নীলাযান ) বালু রাশির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া, যেখানে যেমন পথ পাইয়াছে চিত্র বিচিত্র আকারে প্রবাহিত হইতেছে। মোহনা ও নৈরাঞ্জনা নামে উত্তর বাহিনী দুইটি পার্ব্বত্য নদী, বালুর উপর দিয়া আসিয়া বুদ্ধ গয়ার কিছু উত্তরে পরস্পর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া গয়ার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া ফল্গু নামে বহিয়া যাইতেছে। নৈরাঞ্জনা শাখার উপর বুদ্ধ গয়া প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রাচীন নাম উরুবিল্ব পরে উরুবেলা। গ্রামটি চতুপার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা উচ্চ ভূখণ্ডে অবস্থিত। পথে আসিতে আসিতে আমরা দূর হইতে বুদ্ধ গয়া মন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখিতে পাইতে ছিলাম। মহাবোধি মন্দির ১৮০ ফিট উচ্চ। নৈরাঞ্জনার পার্শ্ব ছাড়িয়া আমাদের মোটর ঘুরিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ পথের উপরকার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা অবতরণ করিলাম। অল্প দূর হইতে মন্দিরটির লীলাভ ছটা মনোহর যেন নানা রঙে রঞ্জিত। নিকটে আসিয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে এই বহু প্রাচীন মন্দিরটি সংস্কার দ্বারা অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে, বেশ বুঝা যায়। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আদি মন্দির বা বিহার ছিল মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের নির্ম্মিত। খৃষ্টীয় সনের তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তৎপরে বহু ভাগ্য বিপর্য্যযের পর ভগ্ন জীর্ণ এই মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয় আর্য্যাবর্ত্তের শক নৃপতিগণ দ্বারা, খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দে। কাহারও কাহারও মতে তাহার পর মন্দিটির বর্ত্তমান গঠনের মত গঠন দেওয়া হয় রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন অমর সিংহ কর্ত্তৃক, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সে আজ প্রায় সার্দ্ধ সহস্র বর্ষের কথা। কিন্তু ইহা

সম্বন্ধবাদী সম্মত মত নহে। মন্দিরটির শেষ সংস্কার হয় মুসলমান বিজয়ের পর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক। মন্দিরটি নীলাভ রক্ত ইষ্টকে নির্ম্মিত, কোন ইঞ্জিনীয়ার নাকি বলিয়াছেন আগা-গোড়া কাঁচা ইটের গাথুনি। তাহা হইলে এটি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতীত গৌরবের সাক্ষীও বটে অপিচ অদ্ভুৎ একটী শিল্পকীর্ত্তি, অপূর্ব্ব কৌশলে দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত, স্বীকার করিতেই হয়। ইহার সুদৃশ্য কলসশোভী চূড়া ছিল না, অঙ্গ সৌষ্ঠব লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছিল, বহু কাল ধরিয়া রৌদ্র জল বাতাস সহিয়া কতক কতক অংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, কোন কোন অঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই বহু প্রাচীন মন্দিরের ভগ্ন জীর্ণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ সালে বহু অর্থ ব্যয়ে ইহার সংস্কার সাধনে হস্তক্ষেপ করেন। ১০।১২ বৎসরে ভাঙ্গা অংশ যোড়া দিয়া, ফাটা অংশ বুজাইয়া, নষ্ট অংশের, লুপ্ত অংশের, পুনরুদ্ধার করিয়া, বালি চুন পাথর লাগাইয়া, এখন মন্দিরটির এমন পরিষ্কার আকার দাঁড় করান হইয়াছে যে দেখিলে মনে হয় যেন অল্প দিনের নির্ম্মিত। প্রাঙ্গন খনন কালে মাটির ভিতর হইতে ছোট একটি আদর্শ পাওয়া যায়, সেই আদর্শানুসারে এই বিহার সংস্কৃত হয়। কিন্তু বহু পূর্ব্বে ইহার আকার যে অন্যবিধ ছিল তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

রাস্তা হইতে প্রায় কুড়ি ফিট নামিয়া তবে মন্দির প্রাঙ্গনে আসিতে হয়। পরিষ্কার সোপান আছে। ১৮৮৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মন্দির প্রাঙ্গন নাকি রাস্তার সমভূমিতে ছিল। মন্দিরের মেঝিয়াও সেই সমতলে ছিল। গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ সন্ধান পাইয়া বোধ হয় Sir Ashely Eden সাহেব লেফটনাণ্ট গবর্ণরের আমলে এখানে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাতে মন্দিরের সমগ্র নীচের তলা বাহির হইয়া পড়ে। সমগ্র একতালা ইমারত ও তাহার চতুষ্পার্শস্থ অলিন্দাদি সহ ভূমি ভাঙ্গা পাথরখণ্ড-ভাস্কর্য্যাদি মাটী ও বালুতে ভরাট হইয়া চাপা পড়িয়া ছিল। নৈরাঞ্জনার

বন্যা নাকি সময় সময়ে রাশি রাশি বালু আনিয়া এই ভরাট কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। প্রাঙ্গন খনন করিতে করিতে বিস্তর প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি ভাস্কর্য্যের নমুনা স্থাপত্যের নিদর্শন ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার কতক কতক বিলাতে Kensigton Meuseumএ, কতক কলিকাতার যাদু ঘরে কতক বা অন্যত্র চালান হইয়াছে, অল্প স্বল্প নব নির্ম্মিত প্রাঙ্গনের ইতস্ততঃ রক্ষিত আছে। মন্দিরটি ত্রিতল কক্ষ বিশিষ্ট, সর্ব্বোপরি তলার পথ এখন বন্ধ কেন কে জানে। এখন যেটি দ্বিতল, খননের পূর্ব্বে তাহাই ছিল প্রথম তল বা নিম্ন তল। চৈনিক পরিব্রাজক খ্যাতনামা হিয়াং চুয়াং সেই প্রায় সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে এই বৌদ্ধ মন্দিরের যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এখন নাকি এই নব সংস্কার প্রাপ্ত অবস্থায় তাহার প্রায় সমস্ত মিল পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ধরিয়া লইতে হয়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও মন্দিরাকৃতি মোটামোটি এখনকার মতই ছিল। হিয়াং চুয়াং যে প্রকাণ্ড বৌদ্ধমূর্ত্তি নিম্নতলে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে মূর্ত্তি এখন আর নাই। সে ছিল প্রস্তর মূর্ত্তি, তৎস্থলে ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক একটি পোড়া মাটীর বৃহৎকায় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, পরে মন্দির সংস্কার কালে সে মূর্ত্তি সরাইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী মাঠ হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট অপর একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, ইদানীন্তন বৌদ্ধ সম্প্রদায় জাপান হইতে একটি চন্দন কাষ্ঠের নেত্রমুগ্ধকর সুবৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, অভিপ্রায় ছিল, এই নিম্নতলে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু বুদ্ধ গয়ার মোহন্ত মহারাজ এই মন্দিরের অধিকারী স্বরূপে সে মূর্ত্তিকে মন্দির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। শেষ ফৌজদারী কাণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, পরিণামে হিন্দু মোহন্তের জয় হয়। তাঁহার অধিকার দূর করাইবার জন্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা গড়াইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেব

বিষ্ণুর অবতার হিন্দুর দেবতা সাব্যস্ত হওয়ায়, উদ্যোগী বৌদ্ধেরা বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তুলার ভিতর করিয়া, বহু যত্নে খণ্ডে খণ্ডে আনীত, বিরাট বুদ্ধ কলেবর যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইখানেই প্রতি-প্রেরিত হয়। কেহ কেহ বলেন, নিকটস্থ ব্রহ্মবাসীগণের অতিথিশালায় সে মূর্ত্তিটি সুরক্ষিত আছে। এখনকার বৌদ্ধ নায়ক শ্রীমান ধর্ম্মপাল মহোদয় এই মন্দিরে স্থাপিত করিবার জন্য একটি শ্বেত পাথরের সুন্দর নাতিবৃহৎ বুদ্ধ মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন মন্দির অধিকারী সেটিকেও ভিতরে স্থান দেন নাই। মূর্ত্তিটি দেখিলাম রাস্তার অপর পারে এক গুদামের মত স্থানে নানা মালপত্রের মধ্যে এক জালবদ্ধ অলিন্দে বিরাজ করিতেছে। যদি এই স্থানে অবস্থানের জন্য কোনও কারণ না থাকে, মূর্ত্তিটিকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, মন্দির মধ্যে বুদ্ধ মূর্ত্তিকে পূজার্চ্চনা করিবার হিন্দু ও বৌদ্ধের সমান অধিকার দেওয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী পূজায় আপত্তি উত্থাপিত হয় না। শুনা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপে মহাবোধি জনপদ বহুকাল ধরিয়া জনশূন্য অবস্থায় ছিল, মহাবোধি মন্দিরের দিকে কেহ বড় ফিরিয়াও চাহিত না খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গিরি উপাধিধারী এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া মঠ স্থাপনা করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নিকটবর্ত্তি জমিদার-দিগের সাহায্যে ভূসম্পত্তিশালী হইয়া উঠেন। মহাবোধি মন্দির তাঁহাদের অধিকারে আইসে। বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ তাঁহাদেরই উত্তরাধিকারী। ইনি নেপাল দেশের ব্রাহ্মণ বংশজাত, অবশ্য হিন্দু, এখন এ অঞ্চলে ইনি একজন প্রধান ভূম্যধিকারী।

যাহা হউক, আমরা বুদ্ধ মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া, বৌদ্ধ যুগের ভাস্কর্য্য সংগৃহীত স্তম্ভ তোরণ খিলান স্তুপ চৈত্য রেলিং আর ভগ্ননাশ খণ্ডদেহ মুণ্ডহীন মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মন্দির দ্বারে—ঠিক দ্বারে নয়

দ্বার পথের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তথায় একটি পাষাণ তোরণ সম্মুখ ভাগে কয়টি সুবৃহৎ ঘণ্টা রক্ষিত আছে ঘণ্টাগুলি নাকি নেপাল ও তিব্বত দেশীয় যাত্রীগণ কর্ত্তৃক উপহৃত। বাহিরে প্রশস্ত রোয়াক রহিয়াছে তাহার একপার্শ্বে জুতা মোজা খুলিয়া, অল্প খানিকটা পথ বাহিয়া, আমরা সম্ভ্রমের সহিত মন্দিরের নিম্ন তলে অলিন্দা শোভী এক কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দ্বার পূর্ব্বমুখ, ঘর অন্ধকার, সম্মুখেই পশ্চিম ভিত্তিতে সংলগ্ন কারুকার্য্য ভূষিত সমুচ্চ সুবৃহৎ পাষাণ বেদীর উপর মধ্যস্থলে পদ্মাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা স্থিত ধ্যানী বৌদ্ধ মূর্ত্তি। মূর্ত্তি যে দেখিতে খুব সুন্দর বলা যায় না। উভয় পার্শ্বে আরও কতক ছোট ছোট মূর্ত্তি রহিয়াছে। বেদীর উপর ফুল চন্দন আছে, একটি লোক বসিয়া আছে, কয়েকটি প্রদীপ জ্বলিতেছে সম্ভবতঃ বরাবরই জ্বলে। ক্ষীণ আলো, তাহাতেও বুঝা যাইতেছে প্রধান মূর্ত্তিটি গিল্টি করা, কিন্তু তাহার জন্য মুখের ভাব যেন ভীষণ দেখাইতেছে। কপালে চন্দন রেখা ও ফোঁটা রহিয়াছে মনে হইল, সম্ভবতঃ বিষ্ণুর অবতার-বাদ বজায় রাখিবার জন্যই এই চিহ্নাঙ্কিত করা হইয়াছে। ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া, প্রণামী বেদীর উপর রাখিয়া, আমরা সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কক্ষের বাহিরেই অলিন্দ, তাহার দুই পাশ দিয়া দুইটি সোপান উপর তলায় উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের একজন পথ-প্রদর্শক জুটিয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া গেলাম। উপর তলায় খাটালে খাটালে নানা মূর্ত্তি। সে ব্যক্তি সকলের পরিচয় দিতে লাগিল। এক স্থানে বুদ্ধদেবের জননী মায়া দেবীর মূর্ত্তি। কোন কোন মূর্ত্তির গায়ে সেমিজের মত করিয়া কাপড় ঢাকা আছে, পুরুষ মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে অথচ এইরূপ বেশ। অনেক গুলিই বৌদ্ধ মূর্ত্তি সন্দেহ নাই। পথ প্রদর্শক পরিচয় দিতে দিতে 'সাবিত্রী দেবী' কি 'গায়ত্রী দেবী' কি 'সর্ব্বমঙ্গলা' এই প্রকার মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ নাম বলিয়া গেলেন। চমৎকার। অনেক

মূর্ত্তিরই যা খুসি নাম দেওয়া হইয়াছে; দেখিয়া আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত লাগিল। কেবল এখানে বলিয়া নহে, গয়াতে অনেক স্থলেই এই প্রকার দেব মূর্ত্তিতে বিপর্য্যয়ে! অপর পার্শ্বের সোপান বাহিয়া আমরা নীচের তলায় নামিয়া আসিলাম। এবার দ্বার পথ উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনোদ্যানে আসিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়া মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত জগৎ বিখ্যাত বোধিদ্রুম দেখিতে চলিলাম; দক্ষিণ দিক হইতে মোড় ফিরিয়াই সম্মুখে দেখিতে পাইলাম একটি নাতি বৃহৎ নাতি প্রাচীন পিপ্পল বা অশ্বত্থ পাদপ, তলদেশ পাকা করিয়া বাঁধানো, তাহার পাশেই অর্থাৎ বৃক্ষকাণ্ড ও মন্দির ভিত্তির মধ্যস্থলে একটি গোলাকার বেদী বিরাজ করিতেছে। দেখিয়াই আমরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম; শিরঃ আপনা হইতে নত হইয়া আসিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই কি সেই ধর্ম্মারণ্য, এই কি সেই ধর্ম্মরাজ রোপিত মহাদ্রুম, যাহাকে বায়ু পুরাণে স্তুতি করা হইয়াছে? অথবা এই সেই পাদপ, এই সেই বেদী, যে পাদপ মূলে—যে বেদীর উপর আসীন হইয়া জগতপাবন ভগবান সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন? প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা, রাজপুত্র রাজঐশ্বর্য্য হেলায় ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কান্থা-ধারী হইয়া, মানব জাতির উদ্ধারের নিমিত্ত, জ্ঞান ভিখারী রূপে মগধের ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে, এই স্থানে আসিয়া—আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি সেই স্থানে—সেই ভূমি তাহার সেই পবিত্র চরণরেনু দ্বারা পূত করিয়া—এই তরুমূলে এই বেদীর উপরে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন! জ্ঞান পিপাসু, যে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কস্তুরী মৃগের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন এই স্থানে এই তরুতলে এই বেদীর উপর ৬ ছয় বৎসর ধরিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিয়া সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন! সত্য বুদ্ধির বিকাশে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন! আমি ছুটিয়া গিয়া মস্তক দ্বারা সেই মহা বেদী স্পর্শ করিলাম

সেই মহা পাদপে মস্তক ঠেকাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলাম। বৃক্ষটি দেখিলেই উপলব্ধি হয়, এটি আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন হইতে পারে না, কিন্তু পুরাবিদগণ স্থির করিয়াছেন, মূল বৃক্ষ ধ্বংশ হইলে তাহার বীজ হইতে যে পিপ্পল্ উদ্ভূত হয়, এই তরু তাহার শাখার বংশধর, মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সংস্রব যুক্ত। এখন একটি নয়, কথাটি যেন পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নমস্য পাদপ।

কথিত আছে, মূল বৃক্ষ ধ্বংশ হয় প্রিয়দর্শী রাজা অশোক কর্ত্তৃক, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনের পর, তিনি সেই বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন অশ্বত্থের প্রতি এতদূর অনুরাগ বিশিষ্ট হইয়া পড়েন যে তজ্জন্য ঈর্ষাপরায়ণা রাজমহিষী তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। তাহার শাখা ছিল, একটি শাখা মহাসমারোহের সহিত সিংহলেশ্বরের নিকট প্রেরিত হয়, ভাস্কর চিত্র আছে, অন্য শাখা হইতে অপর একটি বৃক্ষ গজাইয়া উঠে। সেই পাদপ ধ্বংস হয় গৌড়াধিপ কর্ণসুবর্ণেশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত দ্বারা। সেই অশ্বত্থেরও শাখা বীজ সংগৃহীত ছিল; অল্পকালের মধ্যেই সম্রাট পূর্ণবর্ম্মা তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে ক্রমাগত বীজ হইতে, শাখা হইতে, মূল বৃক্ষের বংশ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। খৃঃ ১৮৭৬ সালে জরাজীর্ণ মহীরুহ ঝড়ে উৎপাটিত হইয়া যায় শিকড় হইতে নবীন চারা উদ্গত হইয়াছিল সেই চারাই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পিপ্পল্; ইহাও সেই পূত বোধিদ্রুমের বংশধর বলিয়া গৃহীত। বোধিদ্রুম বলিয়া অর্জ্জিত।

এই বোধিদ্রুমের তলদেশে একটি বেদী, তাহার উপর প্রস্তর আসন বিরাজিত—নাম বজ্রাসন। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই বেদীর উপর এই আসনে আসীন হইতেন, ইহার উপরে বসিয়া ধ্যান মগ্ন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আসনটির উপরিভাগ নানা আকারের রেখা বিন্যাসে

শোভিত ; চক্রাকারে সারি সারি কয় থাক্ পদ্মপর্ণ বজ্রমূর্ত্তি চক্রিকাবাজি খোদিত আছে, মধ্যস্থলে গোলাকার কতক স্থান চিত্রহীন, তাহার অন্তরে চারিখণ্ডে বিভক্ত একটি সম চতুষ্কোন। আসন স্তম্ভের গাত্রে চতুর্দ্দিকে পক্ষী বৃক্ষের চিত্র খোদিত। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই প্রস্তরাসন বুদ্ধদেব কৃত ব্যবহৃত প্রকৃত বজ্রাসন নহে ; আসল বজ্রাসন রহিয়াছে এই বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, প্রাঙ্গনের পারে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত তারাদেবীর মন্দিরের অলিন্দে। আমরা সে আসনও দর্শন করিয়াছি, সেটি গোলাকার গাঢ় নীলবর্ণের একটি প্রস্তরাসন, তাহার সেই নীলবর্ণ শ্বেতবর্ণের শিরা রেখায় পরিব্যাপ্ত ; উপরিভাগ বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্ষুদ্রাকার নানাবিধ সাঙ্কেতিক চিহ্নাঙ্কন খোদিত।

যাহা হউক, বজ্রাসন ও মহাবোধিদ্রুম প্রদক্ষিণ করিয়া, আমরা পশ্চিম হইতে উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে মন্দিরটিও প্রদক্ষিণ করিয়া লইলাম। ঘুরিয়া পুনরায় মন্দির দ্বারের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটী চৈত্য ও স্তূপ রহিয়াছে ; শুনা গেল, সেটি কোন মোহন্তের সমাধি। নিকটেই প্রাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে কয়টি কক্ষ বিশেষ একটি গৃহ, তন্মধ্যে বিকৃতাঙ্গ কয়েকটি দেব মূর্ত্তি ও একটি কক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয় এমন কয়টী মূর্ত্তি আছে প্রায় সকলগুলিই নাশাহীন।

কক্ষের সম্মুখেই একটী খিলান, তন্মধ্যে বিষ্ণুপদের অনুরূপ বৃহৎ বুদ্ধপদ। এই গৃহের অলিন্দ হইতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া, আমরা দেখিতে পাইলাম, গুটী দশ বারো বালুপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন স্তম্ভ সাজাইয়া রাখা হইয়াছে কাহারও গাত্র চিত্রবিচিত্র, কাহারও গাত্রে অক্ষরাবলী খোদিত, কাহারও মাথায় পশু পক্ষী মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এ গুলি অশোক রাজার সময়কার, এক কালে মন্দিরের

চারিধারে এইরূপ স্তম্ভের বেষ্টনী ছিল। সেগুলি দেখিয়া দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে হইতে পথিপার্শ্বে বামদিকে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গন দৃষ্ট হইল, প্রাঙ্গনময় এখানে ওখানে কোথাও বা সারি সারি স্তূপ ও উচ্চ অনুচ্চ নানা আকারের সমাধি স্তম্ভ রহিয়াছে। শুনিলাম সমস্তই মঠের বা মন্দিরের মোহন্তগণের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভ সম্ভবতঃ অস্থি বা চিতা ভস্মের উপর এগুলি গঠিত, প্রাঙ্গন পার্শ্বে কয়েকটি স্মৃতি চিহ্ন বৃত্তাকার বিগ্রহ শূন্য মন্দির বলিলেই হয়। এই পথে আরও অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দিকে একটি বাঁধান পুষ্করিণী পাওয়া যায় নাম 'বুদ্ধ পোখরা।' হয়ত বুদ্ধদেব মহাবোধিতে অবস্থান কালে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন তজ্জন্য এই নাম। আমাদের সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ পুষ্করিণীর উত্তরদিকে চাতাল সমেত বাঁধা ঘাট ও তাহার উপর সুধাধবলিত সারি সারি স্তম্ভ শোভিত পাঁচ ফুকরিয়া চাঁদনি দেখিতে পাইলাম। চাঁদনিটির আকার গঠন প্রাচীনের মত নহে। কেহ কেহ বলেন প্রাঙ্গন হইতে উদ্ধৃত ধ্বংশাবশেষ দ্বারা ঘাট ও চাঁদনি নির্ম্মিত। ঘাটে নামিয়া আমরা পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করিলাম। জল বিশেষ পরিষ্কার নয়, নানাবিধ উদ্ভিজ্জে ভরা, আমাদের হাতে ঝাঝি উঠিয়া আসিল।

সমাধি প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ দিয়া মন্দির সীমানার বাহিরে যাইবার খিড়কি পথ আছে। সেই পথ ধরিয়া আর দুইটি ছোট প্রাচীন মন্দিরে যাওয়া যায় আমরা সে পথে যাই নাই, কতকগুলি ব্রহ্মদেশীয় রমণী সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে, সেখানে জটলা করিতেছেন দেখিয়া আমরা সরিয়া আসিলাম।

বুদ্ধ মন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গনের পূর্ব্বদিকে কিছু উপরে অর্থাৎ রাস্তার সমভূমিতে দুইটি প্রাচীন ছোট ছোট জীর্ণ মন্দির আছে, একটির নাম তারা দেবীর মন্দির, অপরটি বাগেশ্বরী দেবীর মন্দির, প্রাচীন মহাবোধি মন্দিরের অনুকরণে গঠিত। আমরা মন্দির প্রাঙ্গন হইতে পূর্ব্ব সীমানার ঢালু পাড়

বাহিয়া উপরে উঠিয়া উভয় স্থলে গিয়াছিলাম। স্ত্রী দেবতার নামে, মন্দির নাম কিন্তু উভয় অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দেখিলাম পুরুষ মূর্ত্তি। একস্থলে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, অপরস্থলে উপবিষ্ট মূর্ত্তি; দেবী মূর্ত্তি মনে করিবার কোন লক্ষণই নাই, অথচ মন্দির দুইটি দেবী মন্দির বলিয়া পরিচিত। মন্দির প্রকোষ্ঠ মধ্যে অপর কোনও মূর্ত্তি নাই। একি প্রহেলিকা! দেবী অন্তর্দ্ধান! এখানে এক অলিন্দে আমরা কৃষ্ণনীল এক প্রস্তরাসন বেদী দেখিয়াছিলাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

মঠ মন্দিরাদি দর্শন করিবার পর, আমরা মোহন্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার আবাস-ভবনাভিমুখে গমন করিলাম। এখান হইতে বসিটাক্ পথ দূরে। মোহন্ত মহারাজের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, একটি সুরক্ষিত দুর্গ বলিলেও হয়। সুবৃহৎ খিলানের ফটক, তথায় বহু অস্ত্র সস্ত্র প্রহরী। ফটক পথে আমাদের মোটর ভিতরে প্রবেশ করিল। এই দীর্ঘ পথের বামে রাজ ঐশ্বর্য্যশালী সন্ন্যাসী মোহন্তের প্রাসাদ, দক্ষিণে প্রাচীর বেষ্টিত তাঁহার সুরম্য উদ্যান, বৃহৎ উদ্যান, উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অপর একটি রমণীয় অট্টালিকা, শুনিলাম, কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কিম্বা বিশিষ্ট অতিথির শুভাগমন হইলে, তাঁহাদিগকে এই হর্ম্ম্যবাজিতে আশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। মোটর ভিতর পথে বামে একটি মোড় লইয়া এক বিশাল প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল; সে প্রাঙ্গনে পাল পাল গো-বৃন্দ—তাহার মধ্যে ষাড় গাই বাছুর সবই আছে বিস্তর, আরও রহিয়াছে এক ঝাঁক রাজহংস—বহুসংখ্যক। গরুর যেমন দুধ পাওয়া যায়, কাজে লাগে। মোহন্ত মহারাজ এত হংস লইয়া কি করেন? কোন উপকারে আসে মনে ত হয় না। শোভা? হংস ডিম্ব তাঁহাদের নিকট ত অখাদ্য। মহারাজের হাতী উট ঘোড়াও অনেক আছে। পশুশালা না থাকুক, অনেকগুলি জানোয়ার পোষা হয়ত ঐশ্বর্য্যের অঙ্গ। আমাদের মোটর

গরু বাছুর বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রাসাদের সদর দরজার কাছে আসিয়া লাগিল। গাড়ি থামিলে আমরা দেখিতে পাইলাম গেরুয়া আল্‌খাল্লা উষ্ণীষধারী সন্ন্যাসীর (?) দল সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর ছাদ হইতে, বারাণ্ডা হইতে, জানালা হইতে ঝুঁকিয়া নব আগন্তুকগণকে নিরীক্ষণ করিতেছে;—দেখাইতেছিল ঠিক যেন পর্ব্বত গাত্রে গাছে গাছে জীব বিশেষের দঙ্গল। একটু পরে একজন পূর্ব্বরূপ বেশধারী সন্ন্যাসী মুণ্ডিত মস্তক মুণ্ডিত গুম্ফশ্মশ্রু—যদিও সকলে এখানে মুণ্ডিত বদন নহেন, আমাদের মোটরের নিকটে আসিয়া হস্ত সঙ্কেতে আহ্বান করিলেন; মুখে কথা নাই, ইসারায় জানাইলেন, তিনি সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া যাইবেন। অদ্ভুত! যান হইতে নামিয়া আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। প্রাঙ্গনের ধারে ধারে নীচু রোয়াক আছে; ফুটপাথের মত রোয়াকের উপর দিয়া আমরা দ্বার পথের ভিতর আসিয়া সেইখানে জুতা মোজা খুলিলাম। এখানেও অনেকগুলি দ্বারবান আছে যদিও সশস্ত্র নহে। দ্বার পথের পরই একটি নাতি বৃহৎ উঠান, উঠানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উপরে উঠিবার পথ, একটা অপরিসর অন্ধকার উঁচু উঁচু ধাপওয়ালা অমার্জ্জিত পাথরের সোপান; সেই সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরতলায় উঠিলাম; গেরুয়াধারী পথ প্রদর্শকটি অন্তর্দ্ধান করিলেন; আর এক গেরুযাধারী সেখান হইতে আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া বৈঠকখানা ঘরে পৌছাইয়া দিলেন। বেড়া ঘর মেঝিয়াতে ঢালা বিছানা, প্রায় মধ্যস্থলে একখানি গদী মোড়া কৌচ, উপস্থিত শূন্য; বুঝিতে পারিলাম মহারাজের সিংহাসন। মেঝিয়াতে দুইজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বেশধারী খানকতক মুদ্রিত পুস্তক লইয়া কি করিতে ছিলেন, বোধ হয় পাঠ মিলাইতে নিযুক্ত ছিলেন। নিকটে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপবিষ্ট, পরে শুনিয়াছি তিনি মোহন্ত মহারাজের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ। তাঁহার সহিত আলাপ হইল। জানিতে পারিলাম, জগৎগুরু

শঙ্করাচার্য্যের কোন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থের পাঠ মিলান হইতেছে। অনতি-বিলম্বে স্বয়ং মোহন্ত মহারাজ আসিয়া দর্শন দিলেন মুণ্ডিত মস্তক উষ্ণীষ হীন, মুণ্ডিত বদনমণ্ডল মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর সদাই বিকম্পিত, সৌম্য শান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি, গেরুয়া রঞ্জিতবাস অঙ্গে, পরমহংসের মত আকৃতি। দেখিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিকটে গিয়া পায়ের কাছে প্রণামী রাখিলাম। দেহ স্পর্শের মত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করতঃ অভিবাদন করিলাম। তিনি স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করিয়া আমাকে বসিতে আদেশ দিয়া সেই কৌচের উপর আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে, ইতিহাস সম্বন্ধে, কিছু কিছু কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। রামায়ণে বুদ্ধদেবের উল্লেখ লইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর অবশ্য রক্ষণশীল হিন্দুজনোচিত সাম্প্রদায়িক ভাবের হইয়াছিল। তা হউক কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম মোহন্ত হইলেও মহারাজ যথার্থ পণ্ডিত লোক, সন্দেহ নাই। তিনি বাঙ্গালী জাতির বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন, স্পষ্টই বলিলেন, বুদ্ধ মন্দির লইয়া বৌদ্ধদের সহিত বিবাদে বিহারীরা তাঁহাকে মজাইবার উপক্রম করিয়াছিল, বাঙ্গালীরাই বাঁচাইয়া দিযাছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে কমিশন বসিযাছিল, কমিশানে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার জোবানবন্দী লইতে আসিয়াছিলেন, তিনি বায়ু পুরাণ হইতে, অগ্নি পুরাণ হইতে কি সব প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাদের বেশ করিয়া বুঝাইযা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহার ব্যবস্থা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। এই প্রকার কত কি কথা বলিতে লাগিলেন। জানিতে পারিলাম, তিনি তাঁহার গ্রন্থাগারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বুদ্ধদেব বিষয়ক সমস্ত গ্রন্থাদি সাধ্যমত সংগ্রহ করিতেছেন, দেখিলাম গোঁড়া হিন্দু হইলেও তাঁহার তেমন অন্ধ বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই। মন্দির লইয়া বিবাদ স্বতন্ত্র কথা। লাইব্রেরিয়ান বাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্কলিত 'ললিত বিস্তর' এক খানি সংগ্রহ করিয়া দিতে

আমাকে অনুরোধ করিলেন, কলিকাতায় কাহার নিকট উক্ত গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার আভাস পর্য্যন্ত দিয়া দিলেন। আমি চেষ্টা করিব বলিয়া আসিয়াছি। তাঁহার পাঠ-মিলন কার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে বুঝিয়া, মোহন্ত মহারাজকে বলিলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁহার সময় নষ্ট করিয়াছি, আর না, এইবার বিদায় হই। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া স্মিত, মুখে বলিলেন, সময় কিছুই নষ্ট হয় নাই, 'আপ কো সাথ এই কামই তো হোতা থা।' অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাই ত হইতেছিল। ভাল লোক না হইলে এমন কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না। আমরা বৈঠক খানা হইতে বাহিরে আসিতেই, গুম্ফ শ্মশ্রুধারী উষ্ণীষ গেরুয়াধারী একজন সন্ন্যাসী মোহন্ত মহারাজেরই চেলা বোধ হয়—আমাদের সাদরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিছু দূরে দক্ষিণ দিকে এক ছাদে লইয়া উপস্থিত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম জলযোগ করাইবার উদ্যোগ হইতেছে। আমি পাতে বসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, হাতে যা হোক কিছু প্রদান করিতে বলিলাম। তিনি এবং তত্রস্থ তাঁহার সঙ্গীগণ না ছোড়্-বান্দা। আসনে না বসাইয়া ছাড়িলেন না। ভদ্রতার খাতিরে একবার বসা গেল। মহারাজের ঘরের গাইয়ের দুগ্ধে প্রস্তুত ক্ষীর খুব ঘন ও ঝরো যেন মোহন-ভোগ, আর গয়ার পরোটার মত খাজা ও অন্যান্য মিষ্টান্ন কিছু কিছু আমরা অল্প অল্প মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। আচমন করিতে ছাদের ধারে গিয়া দেখি আমাদের মোটর চালক ও তাহার সহচরকেও জলযোগে বসান হইয়াছে। মন্দ আতিথেয়তা নহে। হাত মুখ ধুইবার জল পরিচারক ঢালিয়া দিল, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাম্বুল যোগাইলেন। ছাদ হইতে দক্ষিণ দিকে মহারাজের সাজান বাগান ও তাহার দক্ষিণ প্রান্তে বিশিষ্ট অতিথি-শালার নয়নরঞ্জক শোভা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। উদ্যানে একটি জলযন্ত্র আছে চমৎকার। ক্রমে নমস্কার পুরঃসর বিদায় লইয়া, আমরা

নামিবার পথের পানে অগ্রসর হইলাম, সেই পূর্ব্বকথিত মৌন সন্ন্যাসীটি আবার আসিয়া জুটিলেন। সিড়ির ধাপ বিষম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দেখাইয়া দিলেন,—সিড়িতে অবতরণ করা কঠিন বলিয়া, সোপান গৃহের ছাদ হইতে একটি দীর্ঘ শিকল লম্বমান আছে, সেই শিকল ধরিয়া অবরোহণ সহজ ও নিরাপদ। আমরা তাহাই করিলাম। নিম্নতলায় দপ্তরখানা আছে, সোপানাবলীর পাশ দিয়াই প্রবেশ পথ; সেখানে বিরাট আয়োজনের বন্দোবস্ত, রাজযোগ্য দাতব্যাগার, মোহস্ত মহারাজকে অনেকগুলি প্রাণের অন্ন যোগাইতে হয়। উচিত ব্যবস্থা। স্বেচ্ছায় যে যাহা দান করে দপ্তরখানায় জমা দেওয়া নিয়ম, আমি যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিলাম। পথ প্রদর্শকটি আঙ্গিনায় আসিয়া মৌন হইয়া হাস্য মুখে হাত পাতিলেন, সামান্য কিছু অর্পন করা গেল। সদর দরজায় আসিতেই হাত পাতিবার লোক অনেকগুলি জুটিয়া গেল। দ্বারবানেরা, পরিচারকেরা সারি বাধিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম জানাইল; মোটের মাথায় সকলের জন্য কিছু প্রদান করিয়া বাহিরে আসিয়া আমরা মোটর আরোহন করিলাম। মোটর চালাইবার চাবি ঘুরাইতেই সেই শব্দে আবার সেই দোতালায় তেতালায় ছাদে বারাণ্ডার জানালায় গেরুয়া পরিহিত অগুন্তি যুবদের আর্বির্ভাব হইল ফটপাতের উপর মোটরের সন্নিকটে দাঁড়াইয়াও অনেকে কল কবজার গতিবিধি উৎসুক্যভবে দর্শন করিতেছিল। মোটর হুঙ্কার দিতে দিতে প্রাঙ্গনে চক্র দিয়া ঘুরিয়া, রাজহংসকুলকে মুখর পর্য্যাকুল করিয়া, গো-বৃন্দকে ইতস্ততঃ খেদাইয়া, ধীরে ধীরে প্রাঙ্গন ও ফটক পথ পার হইয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ফিরিবার মুখে একবার মোটর-স্বামী গয়ালী ঠাকুরের মোকাম হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। গৃহস্বামী যথেষ্ট আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মনের সুখে স্বস্থানে ফিরিয়া আসা গেল। গল্প করিতে করিতে মহাবোধি মন্দির মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল।

সমগ্র গয়া জিলা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পবিত্র ভূমি বা তীর্থস্থান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। খৃষ্টীয়ানের যেমন যেরুসিলাম, মুসলমানের যেমন মক্কা মেদিনা, নৈষ্টিক হিন্দুর যেমন কাশী জগন্নাথ, বৌদ্ধের তেমনি গয়া জিলা। তন্মধ্যে মহাবোধি মন্দির ও বোধিদ্রুম সহ বুদ্ধ গয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য ক্ষেত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান গৌতম শাক্যসিংহের সাক্ষাৎ সংস্রবে পদরেণু স্পর্শে এবং শ্রীমুখ ভারতীতে গয়া জিলার অধিকাংশ স্থান পরিপূত। কিন্তু ভারতবর্ষে কি বঙ্গবিহারের অন্যত্র যেরূপ, গয়াতেও তদ্রূপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথক ও প্রচলিত ধর্ম্ম হিসাবে অধুনা লয় প্রাপ্ত।

হিন্দুধর্ম্ম মহামহীরুহের একটি শাখা—প্রধান শাখা স্বরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময়ে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল; বহুকাল পর্য্যন্ত সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া গৌরবোজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিয়াছিল; তাহার পর ক্রমে ক্রমে শুখাইয়া ঝরিয়া মুল পাদপেই লীন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্ম ভূমিতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব আর নাই; তবে সেই শাখা হইতে সমুৎপন্ন কলমের চারা এখানে ওখানে এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার ফলচ্ছায়া জগতের এক তৃতীয়াংশ মানবের প্রাণে স্বস্তি শান্তি আনয়ন করিতেছে; কিন্তু মুল পাদপের লক্ষণ তাহাতে অল্পই লক্ষিত হয়।
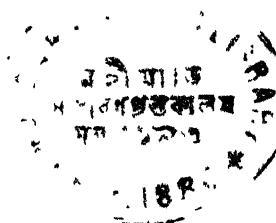
# বরাবর পাহাড়।

গয়াধামের কাযকর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া বসিয়া আছি, বন্ধুবর ক—বাবু সন্ধ্যার সময় আসিয়া খবর দিলেন, সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে, কল্য প্রাতে "বেলা" ষ্টেশনে হাতী আসিয়া অপেক্ষা করিবে, বরাবর পাহাড় দেখিতে যাইতে হইবে। তিনি আরও জানাইলেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের যোগাড় পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, পাহাড়ে গিয়া ভোজ্য অভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। তবে, পাহাড়ে উঠিবার পূর্ব্বে নীচের ঝরণা হইতে কলসী দুই জল যেন সঙ্গে লওয়া হয়, নহিলে পানীয় জলের জন্য কিছু কষ্ট হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেখানে কলসীই বা পাইব কোথায়, জলের কলসী বহিয়াই বা লইয়া যাইবে কে? আমরা ত সঙ্গে চাকর লইব না।" শুনিলাম, পাহাড়ের তলদেশে দেশওয়ালী 'বেগার' লোক পাওয়া যায়, তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ দিতে চাহিলেই তাহারা কলসী সংগ্রহ করিয়া দিবে, আনন্দে সঙ্গে যাইতে সম্মত হইবে। বন্ধুবর পরামর্শ দিলেন, অল্প সল্প বিছানাপত্রও সঙ্গে লওয়া ভাল, হাতীর পিঠে বোঝাই হইয়া যাইবে ভাবনা কি? পাহাড়ের উপর যদিই বা বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হয়।

কলিকাতা হইতে শুনিয়া গিয়াছিলাম, গয়ার আশেপাশে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে বরাবর পাহাড় অন্যতম। ইহার উপর, অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে, কতকগুলি সুন্দর গুহা আছে, পালিস করা পাথরের, দেখিতে চমৎকার। বহু ভদ্রলোক, সাহেব বিবি পর্য্যন্ত, কষ্ট স্বীকার করিয়া সেগুলি

দেখিতে গিয়া থাকেন, দেখিয়া সকলেই তারিফ করেন। শুনিয়া অবধি আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, গয়ায় যাইতেছি, সুবিধা হয় ত সেগুলি দেখিয়া আসিব। বিধাতা দেখিবার সুবিধা জুটাইয়া দিলেন।

কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে পর্য্যটন আমার অতি সামান্য হইয়াছে। আগামী কল্য প্রাতে হস্তী আরোহণে পাহাড় দেখিতে—গুহা দেখিতে যাইব, উৎসাহে উত্তেজনায় সারা রাত্রি ঘুম হইল না। আগে হইতে বলা ছিল, ভোর হইতে না হইতে দ্বারবান আসিয়া খবর দিল, ষ্টেসনে লইয়া যাইবার গাড়ী হাজির। একটি আত্মীয় সঙ্গী হইতে চাহিলেন। সামান্য কিছু বিছানা, একটি 'কিট' ব্যাগ ও তাঁহাকে লইয়া দুর্গা বলিয়া যাত্রা করা গেল। বাসায় বলিয়া গেলাম, খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে, ফিরিতে রাত্রি ১২টা ১টা হইবে।

বরাবর পাহাড় যাইতে হইলে, পাটনা গয়া লাইনে একটু উজান বহিয়া, রেলপথে গয়া হইতে তৃতীয় ষ্টেশন 'বেলা'—সেখানে নামিতে হয়; মাত্র আধ ঘণ্টার রাস্তা। বেলা হইতে হস্তী, ডুলি, এক্কা' পাল্কী, চড়িয়া ভদ্রলোকে বরাবর গমন করেন। পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিলে এক্কা পাল্কী ডুলি বা খাটুলি ভাড়া পাওয়া যায়; হাতী ভাড়া মিলে না, নিকটবর্ত্তী জমিদার মহাশয়দিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

বরাবর পাহাড় গয়া হইতে সোজাসুজি ১৬ মাইল, পুরাতন হাঁটা পথ ধরিলে ১৯ মাইল, উত্তরে। ডুলি পাল্কী গরুর গাড়ী কিম্বা মানুষ চলিবার ঐ একটি রাস্তা আছে, শস্যক্ষেত্রের মাঝ দিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। হাতী গমন করেন পথ অপথ বাহিয়া কতকটা সোজাসুজি, 'শর্ট-কাট্', করিয়া লইয়া। এই প্রকারে ২ ঘণ্টায় গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়।

আমরা বেলা ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, হাতী কি তাহার মত অঙ্গ

কিছুর তথায় তখন সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতেছি. অদূরে একটি বাঁধান কূপ দৃষ্টিগোচর হইল, লোকে দীর্ঘ রজ্জু সহযোগে ঢেঁকি কল দ্বারা জল তুলিতেছে; আমরা কিঞ্চিৎ জল চাহিয়া লইলাম, বড় সুবিধা গোছ মনে হইল না। আমাব সঙ্গী আত্মীয়টি প্রস্তাব করিলেন, "আপনি ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করুন, আমি কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখি। নিকটেই টিকাবী মহারাজের সার্কল আফিস, সেখান হইতে একবার সন্ধান লইবাব চেষ্টা করি।" টিকারী মহারাজেরই কোনও হাতী আমাদিগকে লইয়া যাইবে, কথা ছিল।

তিনি প্রস্থান করিলেন, আমি ওয়েটিংরুমে আসিয়া বসিয়া আমাদেব সঙ্গের লটবহরের হিসাব নিকাশ লইতে লাগিলাম।—একখানি মোটা রগ (rug), একটি বালিশ—এই গেল বিছানা; একটি কিট ব্যাগ তাহার মধ্যে দুজনার দুখানা কোঁচানো ধুতি, তোয়ালে, গামছা—স্নানের সরঞ্জাম; অভিপ্রায় ছিল পর্ব্বত ঝরণায় স্নান করিয়া লইতে হইবে; আর, ফলমূল কিছু; একটি বিস্কুটের বাক্স, সামান্য মিষ্টান্ন এবং সঙ্গীটির প্রিয় বাসি লুচি কয়খানা, দুই টুকরা বেগুন ভাজা, কাগজে মোড়া একটু লবণ, আর আলুমিনিয়াম গেলাস একযোড়া। বেশীর ভাগ দুইটি বাতি ও দুই বাক্স দেশলাই—যদি গুহার ভিতর প্রয়োজন হয়। গরম কাপড় চোপড় যথেষ্ট গায়েই চড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। আর ছিল একটি ছাতি—লাঠিরও কাজ করিবে, দরকার পড়িলে মাথা বাঁচাইবে! বিছানাটা সঙ্গে লইব না বলিয়াই স্থির করিলাম; বোঝা যত কম হয় ততই ভাল—বিশেষতঃ যখন বহিবার লোক সঙ্গে নাই। শুধু ব্যাগ আর ছাতি লওয়া যাইবে।

আমার সঙ্গিটির ফিরিয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে লাগিল; আমি ষ্টেশনে ওয়েটিংরুমে চেয়ারে হেলান দিয়া ঈষৎ ভাব-নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম। মনে পড়িল, কিছুদিন পূর্ব্বে এমনি এক সময়ে আমাদের বর্ত্তমান কবি-

সম্রাট * ববাবব পাহাড় দর্শনেচ্ছু হইয়া, এই বেলা ষ্টেসনে আসিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন; এই প্রকাবই তাঁহাব যানবাহানাদি যাহা আসিবার কথা ছিল, আসিয়া পৌছে নাই, তজ্জন্য কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু স্বভাব-কবি সেই চাঞ্চল্যেব মধ্যেও আপন প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিতে পাবে নাই। এই ষ্টেশনে, সম্ভবতঃ এই গৃহে, এমন কি হয়ত এই চেয়াব খানিতেই বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাব অমব লেখনীব মুখ দিয়া তাঁহাব সেই হৃদয়োচ্ছাস স্বতঃই নিঃসাবিত হইয়াছিল,—

"পান্থ তুমি পান্থ জনেব সখা হে—"

বেলাব ইষ্টেশনেব মাষ্টাবটি বেশ ভদ্রলোক। ট্রেণ চলিয়া গেলে পব তিনি আমাব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বাঁকুড়ায় তাঁহাব বাড়ী, বাঁকুড়াব কত গল্প কবিলেন। আমাদেব আগমনেব উদ্দেশ্য শুনিয়া, আঙ্গুল দিয়া দূবেব দূবে মেঘাকাব পর্ব্বতশ্রেণী দেখাইয়া কোন্‌টিব কি নাম বলিয়া সব পরিচয় দিতে দিতে, কত গুহাগহ্ববসাধু সন্ন্যাসীব কাহিনী বলিতে লাগিলেন! আমি মনে মনে কল্পনা কবিতে লাগিলাম, বরাবর পাহাড়ে গিয়া হয়ত কত সাধু সন্ন্যাসীব দর্শন লাভ করিয়া চবিতার্থ হইতে পারিব!

কিছুক্ষণ পবে সঙ্গীটি ফিবিয়া আসিলেন। স্মিতমুখে জানাইলেন, সার্কল আপিসে হাতী আসিয়া উপস্থিত, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীব ভাবে দুলিতেছে, তাহাকে পালা খাওয়ান হইতেছে, টিফিন সাবিয়া অচিবেই ষ্টেশনে পৌছিবে। পবন্তু স্বয়ং সার্কল আফিসাবও ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি ট্রেণে কর্ম্মোপলক্ষে গয়ায় যাইবেন। তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ হইল, অতি সজ্জন ব্যক্তি। বলিলেন—"হাতী প্রস্তুত, অপনাবা কয়জন যাইবেন?" যখন শুনিলেন আমি আব আমাব আত্মীয়টি—এই দুইজন মাত্র যাইব, তখন

* মানসী, ষষ্ঠ বর্ষ, মাঘ ৬৯৮ পৃঃ "রবীন্দ্র সঙ্গমে" প্রবন্ধ দেখুন।

তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—'তাহা হইলে হাতীর উপর যায়গা হইবে, আর একজন লোক আমি দিতেছি, আপনাদের সমভিব্যাহারে যাউক, সেখানে আপনাদের কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে তদ্বির করিবে।' এই বলিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন কর্ম্মচারীর প্রতি কিছু আদেশ করিলেন। তাঁহার ট্রেণ আসিয়া পড়িল, তিনি চলিয়া গেলেন। আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আর খুজিয়া পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ পরেই "হাতি আ গিয়া" হুঙ্কার শ্রুত হইল। ষ্টেশন মাষ্টারবাবু হাস্যমুখে বলিলেন, "চলুন আপনাদের হাতী আসিয়া গিয়াছে।" তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটির নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। বৃদ্ধ মাহুত তখন হাতীকে মাটিতে বসাইবার জন্য সঙ্কেত করিতে লাগিল। ক্রমে মাতঙ্গবর বসিয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড হাতী, বসিয়া থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠদেশ—আমাদের বসিবার স্থান প্রায় এক তালার সমান উচু দেখাইতে লাগিল। মই সিঁড়ি আছে কিনা—উঠিতে হয় কি প্রকারে—একটু ইতস্ততঃ করিতেছি, মাহুত তাড়া দিয়া উঠিল, বলিল—"জলদি জলদি উঠিবে ত উঠ বাবু, নহিলে এখনি হাতী দাড়াইয়া পড়িবে, এ পাগলা হাতী, মানুষ ইহার কাছে দাঁড়াইবার জো নাই।" ষ্টেশন মাষ্টার বাবু দেখাইয়া দিলেন, আমি হস্তী পুঙ্গবের গাত্র সম্বদ্ধ রজ্জু, পুচ্ছের দুই পাশে দুই হাতে সজোরে ধরিয়া, তাহার পশ্চাদ্দেশে হাঁটুর ভর দিয়া বাহিয়া কোন গতিকে পৃষ্ঠোপরি উঠিয়া পড়িলাম, সে জিমন্যাষ্টিক-বিশেষ, জীবন নষ্টের কাছাকাছি। আমার সঙ্গীটিও, ব্যাগটি ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর হস্তে অর্পন করিয়া, লম্ফন উল্লম্ফন প্রলম্ফন প্রক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার পার্শ্বে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিলেন। মাহুত খুব বক্তিয়ার লোক—ক্রমাগত বকিয়া যাইতেছে, তাড়া দিতেছে; ছাতিটি লওয়া চলিল, ব্যাগটি লইবার আর অবসর হইল না, গজরাজ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আর বিলম্ব চলে না কতক ভয়ে কতক বিরক্ত হইয়া বলিলাম

দূর হউক, কাজ নাই ও ব্যাগট্যাগ কিছুই সঙ্গে লইব না। পথে হাতী কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে কে জানে, বোঝা কিছু সঙ্গে না লওয়াই বুদ্ধিমানের কায; হাত খালী থাকাই শ্রেয়, যদিই বা প্রাণ বাঁচাইতে পথিমধ্যে লাফাইয়া পড়িবার আবশ্যকতা হয়। সঙ্গী স্মরণ করাইয়া দিলেন, ঐ ব্যাগটির মধ্যেই যে আমাদের বাঁচন মরণ কাঠি—হাত মুখ মুছিবার সরঞ্জাম, জলযোগের উপকরণ। চুলায় যাক্, এক দিন না হয় স্নানাহার নাই হইল। গজরাজ উঠিয়া আর দাঁড়াইলেনও না, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা আমাদের অতি আশ্যক সামগ্রী সঙ্গে লইতে পারিলাম না; সে সকল ষ্টেশন মাষ্টার বাবর জিম্মায় বেলায় পড়িয়া রহিল। গোলমালে 'বিপত্তী মধুসূদন' নাম গ্রহণ করিতেও মনে পড়িল না। যখন মনে আসিল, তখন অনেকটা আগাইয়া গিয়াছি। কি বিপদ কপালে আছে কে বলিতে পারে?

আমাদের কোথায় যাইতে হইবে মাহুতের জানা ছিল, কিছু বলিয়া দিতে হইল না। গজরাজ হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিলেন; আমরা পা ঝুলাইয়া পৃষ্ঠবদ্ধ রজ্জু কসিয়া ধরিয়া বসিলাম। আমাদের সঙ্গে রহিল পরিধৃত পোষাক পরিচ্ছদ, আমার বুক পকেটে ঘড়ি, মনিব্যাগ, অন্য পকেটে তিনটি কমলালেবু, কিছু সুপারি মশলা, এক টুকরা বাতী, আধ বাক্স দেশলাই। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া বাসা হইতে এগুলি পকেটজাত করিয়া লইয়াছিলাম, নহিলে কি দারুণ কষ্টই যে হইত, বলিবার নয়। হাতী ত চলিয়াছিল; আগে জানিতাম না, এত বড় জানোয়ার—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকায় পশু—ইহাকে চালাইতে হয় ঘাড়ে ক্রমাগত লাথি মারিয়া, মাহুতের হাতে অঙ্কুশ আছে কিন্তু তাহার ব্যবহার অল্পই হইতেছে। মাহুতজী 'ম্যালে ম্যালে' বলিতেছে, ধমক দিতেছে, আর হাতীর কাঁধে লাথি মারিতে মারিতে পায়ের গোড়ালী ঘষিতেছে। এমনতর সদ্ব্যবহার

পাইয়া তবে মাতঙ্গবর চলিতেছেন। চলিতে চলিতে এক একবার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছে, কিম্বা বাহন বদমায়েসি করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন মাহুত হাঁটুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া প্রাণপণ জোরে লোহার অঙ্কুশ আঘাত করিতেছে। কোন কোন বার প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটির অস্ফুট কাতর কণ্ঠ শুনা যাইতে লাগিল। চলিতে চলিতে পথিপার্শ্বে খর্জ্জুর বৃক্ষ, ইক্ষুচারা দেখিতে পাইলে মাহুতের বারণ সত্ত্বেও শুণ্ড দ্বারা ডালপালা ছিঁড়িয়া লইয়া উপভোগ করিতে করিতে গজরাজ চলিয়াছেন। জলাভূমির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে জলপান করিতেছেন, শুণ্ড ঘুরাইয়া ছিটাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; মাহুতের নিষেধে প্রহারে ভ্রুক্ষেপও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেলা হইতে বরাবর পাহাড়ে যাইবার একটি নাতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা আছে, সেই পথে গরুর গাড়ি, ডুলি, পাল্কী, এক্কা, মানুষ চলে। আমাদের মাহুতটি পথ সংক্ষেপ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে হাতীকে সিধা পথ ধরাইয়া চালাইল। সকল মাহুতই বোধ হয় এইরূপ করিয়া থাকে। মাতঙ্গবর কতক সাধারণ পথ বাহিয়া, কতক ক্ষেতের আইলের উপর দিয়া, আইল সঙ্কীর্ণ হইলে ক্ষেতের মধ্য দিয়া ফসল মাড়াইয়া জলা ডোবা ভাঙ্গিয়া, নামিতে উঠিতে, উঠিতে নামিতে, হেলিতে দুলিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা দুইটি আরোহী ভয়ে কাঁটা হইয়া, মাহুতের মুখে নানা কাহিনী শুনিতে শুনিতে রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, যেন তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে চলিলাম। বৃদ্ধ মাহুত পরিচয় দিল, এই হাতীটি 'নয় খুনে' অর্থাৎ নয়টি মনুষ্য খুন করিয়াছে; সম্মুখভাগে মানুষ দেখিলেই মারিয়া ফেলিবার উদ্যম করে; ইহার নাম 'গনেশ প্রসাদ।' ইহার যে জুড়দার, তাহার নাম 'কমলা প্রসাদ।'—সে চৌদ্দখুনে অর্থাৎ চতুর্দ্দশটি মনুষ্যকে যমালয়ে পাঠাইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সেই খুনে হাতীর আরোহী হইয়া আমাদের মনের ভাব কি প্রকার দাঁড়াইয়াছিল,

সহজেই অনুমেয়। চলিবার পথে পঞ্চাশ হাত দূরে মানুষ দেখিতে পাইলেই প্রাচীন মাহুত অকথা কুকথা বলিয়া লোক ভাগাইতেছিল, বলে এখনি হাতী ক্ষেপিয়া তাড়া করিবে। সেই হাতীর পৃষ্ঠদেশে আমরা! ফাঁড়া কাটিলে বাঁচি।

হাতী চলিতে চলিতে কতক পথ অতিক্রম করিয়া মাহুত দূর হইতে দেখাইতে লাগিল, ঐ 'কৌয়াডোল'। উহা একটি সমুচ্চ পাহাড়, নানা আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো চাঁই পাথরের সমষ্টি, উদ্ভিজ্জ খুব কমই আছে। আমরা দেখিতে লাগিলাম, নীচের দিককার কোন কোন চাঁই হইতে খানিক খানিক কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, ভিতরকার grey granite বং পরিষ্কার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই পাহাড়ে বেশী উপর পর্য্যন্ত পথ নাই। সর্ব্বোচ্চ শিখরে একখানা প্রকাণ্ড পাথর খাড়া উঁচু হইয়া আছে দেখা যায়, তাহার ঠিক মাথায় আর একখানা প্রকাণ্ড পাথর নাকি এমন অবস্থায় অবস্থিত ছিল যে উহার উপর কাক (কৌয়া) বসিলেও পাথর খানা দোল (ডোল) খাইত, সেই হেতু এই পাহাড়ের নাম 'কৌয়াডোল।'

কৌয়াডোল বিভিন্ন পাহাড়,—বরাবর শ্রেণীর অন্তর্গত নহে—অনুমান আধক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে হইবে। 'বেলা' হইতে ক্রোশ তিনেক উত্তর পূর্ব্বে। কৌয়াডোল খানিকটা প্রদক্ষিণ করিয়া, হাতী মাহুতের ইঙ্গিতে এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, যেখানে ছাদহীন কতকগুলি গ্র্যানিট্ পাথরের স্তম্ভ খাড়া হইয়া আছে। মাহুত পরিচয় দিতে লাগিল,—সেকালে এখানে এক ঠাকুরবাড়ী ছিল, এ সকল তাহারই ধ্বংসাবশেষ। কেহ অনুমান করেন; ইহাই ছিল বিখ্যাত শিলাভদ্র বিহার। আমরা হাতীর উপর হইতে দেখিতে লাগিলাম, অদূরে ভিতর দিকে কালো পাথরের এক বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি দীপ্ত হইতেছে; উপবিষ্ট মূর্ত্তি, তাহাও বোধহয় উচ্চে ছয় হাত হইবে! এত বড় পাথরের মুরদ্ আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

শুনা যায়, প্রাচীন কালে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের যে মন্দির ছিল, যাহা খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে, সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সে মূর্ত্তি ইহা অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বৃহদাকার ছিল, এখন আর নাই। এখানকার এই মূর্ত্তি এমন অস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে, সামর্থ্যশালী কেহ কেন যে স্থানান্তরিত করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত করিবার প্রয়াস পান নাই, বুঝা যায় না। ছোটখাটো মূর্ত্তি অনেকগুলির ত স্থানচ্যুত ঘটিয়াছে। এই স্থানটাই বা বৌদ্ধগণের তীর্থভূমি স্বরূপে অগণ্য ভক্ত-উপাসক মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে না কেন, বুঝিতে পারি নাই। কৌয়াডোল ছাড়িয়া যাইতে যাইতে পথে পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ কত মূর্ত্তি—কতক বৌদ্ধ, কতক পৌরাণিক দেবদেবী—আমরা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। তাহার কোনটি গণেশ মূর্ত্তি, কোনটি হরপার্ব্বতী, কোনটি মহিষমর্দ্দিনী—কিন্তু চতুর্হস্তা; ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি কতকগুলি, আরও কত কি, চলন্ত হাতীর উপর হইতে সকল মূর্ত্তি চিনিতে পারা গেল না। ইচ্ছা ছিল, নামিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লই; কিন্তু বাহনটির অশেষ গুণ, অধিকবার উঠা নামা করিতে সাহস হইল না। নিকটে বোধ হয় গ্রাম আছে, আমরা দেখিতে পাইলাম ময়লা গা, ময়লা কাপড় পরা স্ত্রীলোক ও কাচ্ছাবাচ্ছা দূর হইতে উদ্গ্রীব হইয়া হাতী ও সোয়ার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এখানটা মনে হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানা!

ক্রমে ঘণ্টা দুইয়ের কিছু বেশীক্ষণ পরে আমরা বরাবর পাহাড়ের পাদমূলে—ইতস্ততঃ গুল্মখচিত অসমতল বিশাল ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাহুত আমাদিগকে পথে কিছু আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আপ লোক সিদ্ধনাগজী দর্শন করেঙ্গে কি সাতঘরা যায়েঙ্গে?"

সিদ্ধনাথজীর নাম ত কৈ পূর্ব্বে কাহারও কাছে শুনি নাই! 'সাতঘরা'

নাম শুনিয়া অনুমান করিলাম, পূর্ব্বকথিত মসৃণ পর্ব্বত গুহার কথাই বোধ হয় বলিতেছে; সম্ভবতঃ সাতটি গুহা আছে, তাই এই নাম। মাহুত বলিল, "সিদ্ধনাথজীর মন্দিরে উঠিবার পথ ঐ দেখা যাইতেছে। সাতঘরা যাইবার পথ এখান হইতে ক্রোশ দেড়েক দূর। অধিকাংশ ভদ্রলোক 'সাতঘরা' দেখিতে এ অঞ্চলে আসিয়া থাকেন। গুহাগুলি পাহাড়ের যে উপত্যকায় অবস্থিত, তাহা তলদেশ হইতে বড় বেশী উর্দ্ধে নয়; সেখানে উঠা অধিক কষ্টসাধ্য নহে। সাহেব বিবিরা পর্য্যন্ত গুহাগুলি দেখিতে আসেন। সিদ্ধনাথজীউর মন্দির অনেক উর্দ্ধে, তথায় বাবুলোক অল্পই গিয়া থাকেন।" আমার সঙ্গীটী মাহুতের কথা শুনিয়াই ত ফরমাইস করিলেন 'সাতঘরা' চল।

আমি বলিলাম—"তা কি হয়? এখানে যদি সিদ্ধনাথজী ঠাকুর থাকেন আমরা হিন্দুর সন্তান, আগে সেই ঠাকুর দেখিতে যাইব।"

সঙ্গী উত্তর করিলেন—"গুহা দেখিতেই ত আসা হইয়াছে, ঠাকুর দেবতা ত সহস্র দেখা আছে; ঠাকুর দেখিয়া তাহার পর গুহা দেখিতে যাইতে হইলে হয়ত বেলা পড়িয়া আসিবে, তখন আর গুহাগুলির ভিতরে কিছুই দেখা হইয়া উঠিবে না।"

আমি অসম্মত হইলাম না। কিন্তু একটা ভাবনা আসিল—সিদ্ধনাথ-জীউর এ পাহাড় ত দেখা হইতেছে বিলক্ষণ উচ্চ, উঠিবার তেমন প্রশস্ত পরিষ্কার পথ ঘাট আছে বোধ হইতেছে না; কোথায় কোনদিকে ঠাকুরের মন্দির কে দেখাইয়া দিবে? জনহীন স্থান, পাহাড়ে বনজঙ্গলে যদি পথ হারাইয়া ফেলি! কপালকুণ্ডলার আবির্ভাবের ত সম্ভাবনা নাই। মাহুতের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলে বুড়া ত হাঁক ডাক আরম্ভ করিল। সেটা এক লোকালয়বিহীন জনমানবশূন্য দেশ, কোথায় কাহাকে পাওয়া যাইবে? যা এক আধটা চাষাভুষা লোক দূরে দূরে ক্ষেতে কাজ

করিতেছিল, কি মাঠে ছাগল চরাইতেছিল, হাতীর সোয়ারী দেখিয়া তাহারা বিনাবাক্যব্যয়ে সরিয়া পড়িল। মাহুত হাঁকিতে লাগিল, "আরে আরে পয়সা মিলে গা, বাবুলোগণকে সিদ্ধনাথজী দর্শন করা দে।"

অরণ্যে রোদন, কেহই সাহস করিয়া নিকটবর্ত্তী হইল না, বরং যে ছিল পলাইল। আমার মনে পড়িল, গয়ার বন্ধুবর উপদেশ দিয়াছিলেন সঙ্গে বিছানা লইতে, এইখানে লোক পাওয়া যাইবে, তাহাদের দিয়া জল বহন করাইতে! চমৎকার।

আর কি করা যায়, সিদ্ধনাথের চরণতলে পৌঁছিয়া তাঁহার দর্শনলাভ হইবে না! আমাদের আদেশানুসারে মাহুত হাতীকে বসাইল; আমরা মরিয়া হইয়া অবতরণ করিলাম। ছাতিটি নামাইলাম, হাতিয়ারের কাজ করিবে। কুছ পারওয়া নেই, কাহাকেও চাহিনা, আপনারাই যাইব। এত কষ্ট করিয়া এতদূর আসা গিয়াছে যখন, সিদ্ধনাথজীউ দর্শন করিতেই হইবে।

মাহুত বলিল—"সিদ্ধনাথজী দর্শনের পর আপনারা পাহাড়ের ওপাশ দিয়া নামিবেন, পথে সাতঘরা পাইবেন, সেইপথ ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিবেন। আমি চলিলাম, সেই পাহাড়ের তলায় হাতী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিবে।" তাহার এবং হাতীর খোরাকী বাবদ হাতে কিছু দিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিবার পথের দিকে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গী বিষণ্নমুখে বলিলেন, "কাজটা ভাল হইল না, অপরিচিত দেশ, জনহীন স্থান।" একটু যে ভাবনা আসে নাই তাহা নহে, কিন্তু তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে; যা থাকে কপালে, পশ্চাৎপদ হইব না। অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ মাহুত চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, গয়ার বন্ধুও আচ্ছা খবর দিয়াছিলেন, পাহাড়ে কোন কষ্ট হইবে না, মধ্যাহ্নভোজনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ঠিকঠাক; এই ত তার নমুনা? কবি-সম্রাটের দশা সব্বারই!

মাহুত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে বাঃ, গোমস্তাজী আ গিয়া ?" দেখিলাম সিদ্ধনাথদেবের চরণে খবর পৌঁছিয়াছে। বন্দোবস্ত অনুযায়ী টিকারী মহারাজের নিকটস্থ জমিদারী কাছারী হইতে গোমস্তা বাবুজী ঠিক সেই সময়ে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনিই আমাদিগকে এখানকার দ্রষ্টব্য সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া দিবেন। মন আশ্বস্ত হইল। সঙ্গীটি তবু গাঁইগুঁই করিতে লাগিলেন,—'গুহাগুলি আগে দেখিয়া লইলে হইত।' গোমস্তা বাবু (অবশ্য হিন্দুস্থানী বা বেহারী) অতি ভদ্রলোক, ব্যপার শুনিয়া তিনি সহাস্তে বলিলেন,—"ভয় কি বাবুজা ? মহাদেবজীউ দর্শনের পর ঐ পথ দিয়াই ত আমাদিগকে নামিতে হইবে, সাতঘরা দেখিবেন বই কি।"

এতটা পথ রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া তৃষ্ণায় আমাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, শুনিয়া তিনি সঙ্গে করিয়া পাহাড়ের তলদেশে এক ঝোপের অন্তরালে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া একটি অপ্রশস্ত অগভীর ঝরণা বহিয়া যাইতেছিল, আমাদের মনে হইল স্বর্গমন্দাকিনী ধারা। আমরা হাত মুখ ধুইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। বেশী বিলম্ব চলে না; ক্রমে আমরা সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া, কাঁটাবন ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, জঙ্গলী গাছপালার মৃদু আঘাত খাইতে খাইতে, অতি কষ্টে আস্তে আস্তে উপরে উঠিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে রৌদ্র ছিল, ছাতি খুলিয়াছিলাম কিন্তু মুড়িতে হইল, বার বার গাছ আটকাইতে লাগিল। অগত্যা ছাতিকে লাঠির কাজে নিযুক্ত করা গেল; মধ্যে মধ্যে তাহার উপর ভর দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। বিষম চড়াই, অতি দুর্গম পথ। চলিয়াছি ত চলিয়াছি, পথ আর শেষ হয় না। প্রায় দুই ঘণ্টা ক্রমাগত উঠিয়া উঠিয়া আমি ত ধুঁকিতে লাগিলাম। বাহিরের লোক সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহার নিকট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। নাক মুখ দিয়া

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। এক একবার ফাঁকা যায়গা পাইলেই উপরদিকে চাহিয়া দেখি, মন্দির দেখা যায় কিনা,—হায় কোন নিশানাই নাই! যখন অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, পথ প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠিয়াছি; প্রায়—পুরা অর্দ্ধেক নহে। এখনও তাহা হইলে অর্দ্ধেকের উপর বাকী। কি সর্ব্বনাশ! মন ত একেবারে দমিয়া গেল। তবু থামি নাই, চলিয়াছি ত। হাঁ করিয়া দম ফেলিতে ফেলিতে উঠিতে লাগিলাম। কাহাকেও কিছু বলিবার আর মুখ নাই। সঙ্গীটি সময় পাইলেন; ঠেস দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কেমন, বলিয়াছিলাম সিদ্ধনাথ দেখিয়া কাব নাই, সাতঘরায় চলুন, শুনিলেন না, কেমন জব্দ?" বাস্তবিক, জব্দই বটে। আমি উত্তর করলাম—লজ্জার মাথা খাইয়া দায়ে পড়িয়া বলিলাম,—অর্দ্ধেক পথ উঠা অপেক্ষা অর্দ্ধেক পথ নামা সহজ, চল, না হয় নামিয়াই যাই।" গোমস্তা বাবু কিঞ্চিৎ অগ্রে চলিতেছিলেন, আমাদিগের কথোপকথন শুনিতেই পান নাই। সঙ্গী মনে পড়াইয়া দিলেন,—"নামিয়া এখন যাইবেন কোথায়? হাতী ত দেড় ক্রোশ পথ দূরে চলিয়া গিয়াছে।" তখন আমার চৈতন্য হইল, হা! সিদ্ধনাথজীউ, কি করিলে! এই স্থানেই আমাকে দেহ রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা বাবা? ভাবিতেছি, হাঁফাইতেছি, কিন্তু মৃদু মন্থরগতিতে উঠিতেছি। পা অবশ হইয়া আসিল। উপর দিকে চাহিয়া দেখি, আমাদের উপর পথ ধরিয়া আমাদের আগে আগে একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দুইটি মুটিয়া সঙ্গে উপরে চলিয়াছেন। মুটিয়াদ্বয়ের মাথায় বড় বড় ঝাঁকা। তখন বুঝিতে পারি নাই ইহারা কে। অগ্রগামী গোমস্তা বাবু আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমরা নিকটে আসিলে বলিলেন—"আর চিন্তা নাই, একটুক্ উপরে কিস্তি, সেইখানে বসিয়া

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া লইবেন, ঠাণ্ডা হইয়া আবার উপরে উঠা যাইবে।” কিস্তি শুনিয়া আমরা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে বলিলাম কিস্তি ত মাৎ হইয়া গিয়াছে, এখন এ জীবনের ছক্ তুলিয়া ফেলিলেই হয়; তার আর বড় বিলম্বও নাই। অতি কষ্টে আরও কিছু পথ উঠিয়া, আরও কতক্ষণ পরে, প্রায় অবসন্ন অবস্থায় আমরা পাহাড়ের এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যেখানে অনেকটা সমতল ভূমি আছে, ঠিক যেন একটা মস্ত বড় বাড়ীর দৌড়দার ছাদ। সেই সানুদেশের এক পার্শ্বে চতুর্দ্দিক পাথর বেষ্টিত লম্বা আকার গভীর একটি হ্রদ, এখন জল অনেক নীচে, সবুজবর্ণ—বোধ হয় পানায় ভরা। পাহাড়ের গায়ে একটি দীর্ঘাকার গর্ত্ত বলিলেই হয়। দেখিতে ঠিক যেন নৌকার খোলার মত; সেই নিমিত্তই সম্ভবতঃ স্থানটার নাম হইয়াছে ‘কিস্তি।’ সমতলভূমি দেখিয়া, আমি কাহারও কথার অপেক্ষা না রাখিয়া সীমানার এক ঢালু স্থানে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম, ক্রমে পা ছড়াইয়া দিয়া, লম্বা হইয়া শুইয়া বাঁচিলাম। সঙ্গীও আমার অনুসরণ বা অনুকরণ করিলেন। গোমস্তা বাবু বসিতে বসিতে বলিলেন,—‘এইখানে কিঞ্চিৎ আরাম করিয়া লউন।’ শায়িত অবস্থায় আমরা দেখিতে পাইলাম, এই সমতল ভূমির অপর প্রান্তে সেই পূর্ব্বকথিত লোকটি মুটিয়াদ্বয়ের মোট নামাইয়া দিয়া আমাদের মুখ হইয়া বসিল। গোমস্তা বাবু মোট নিকটে আনিতে বলিলেন। তখন বুঝিতে পারিলাম এই মুটিয়ারা আমাদের জন্যই জিনিষ পত্রই আনিয়াছে। নানান্ দ্রব্য—চাল, দাল, নুন, তেল, পিতল কাঁসার বাসন, মায় হাঁড়া কলসী, বাঁধিবার সরঞ্জাম পর্য্যন্ত। মনে হইতেছে যেন আসন কম্বলও তৎসঙ্গে ছিল। দেখিয়াই আমার সঙ্গীটি ত লাফাইয়া উঠিলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—“আপনি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, আপনার জন্য খিচুড়ি বাঁধিব।” শুনিয়াছি, তামাকু-খোর কাহারও তামাকু বাসনা

হইলে, সে পাশের লোককে বলে ওহে তামাক খাও না—অর্থাৎ তাহা হইলে নিজের খাওয়াটা হয়। সঙ্গীর মতলব বুঝা গেল। এতক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে ক্ষুধা রাক্ষসী তাঁহাকে রীতিমত আক্রমণ করিয়াছে। করিবারই ত কথা। কোন্ সকালে সেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাসা হইতে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া যাত্রা করা গিয়াছে, তাহার পর এই সুদীর্ঘ পথ—কঠিন শ্রম। কষ্টে—শ্রমে আমার নিজের ক্ষুধা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; কিন্তু তৃষ্ণা—মরুভূমির পিয়াস—দাবানলের মত কণ্ঠ তালু দগ্ধ করিতেছিল। আমি সঙ্গীর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। রাঁধিয়া বাড়িয়া খাইতে-দাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে; এই অতি দুর্গম পথ, হয়ত ঠাকুর দর্শনান্তর এতটা নামিতে নামিতে আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে হাতীর কাছে পৌছাইতে পারিয়া উঠিব না।

গোমস্তা বাবু স্মিতমুখে বলিলেন--"ভয় কি বাবুজী, আপনাদের জন্যই এই সমস্ত আনান হইয়াছে, মনের সুখে উপভোগ করুন! মনোরম এই স্থান। আপনাদের মত কত বাবুলোক সিদ্ধনাথজী দর্শন করিতে আসিয়া একদিনে সমস্ত পথটা অতিক্রম করিতে পারে না, এইখানে বিছানা পাতিয়া সুখে রাত্রি কাটাইয়া, পরদিন দেবদর্শনে গমন করেন।"

এতক্ষণে গয়ার বন্ধুবরের মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিছানা পাতিয়া লইবার উপদেশের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইল। নিকট দিয়াই একটি ক্ষীণশরীরা স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য ঝরণা ঝির্ ঝির্ করিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাতে মুখ প্রক্ষালন করিয়া, একটু জল গলাধঃকরণ করিয়া শাহারার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে যাইতেছি, সঙ্গীটি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহা খাপ্পা। বলিয়া উঠিলেন—"জল ব্যবহার করিবেন না, করিবেন না, করিলেই ব্যারাম, জলে এই পাতা পচা, এই কাদা, ঐ জঞ্জাল ইত্যাদি।"

তখন তাঁহার এই উপদেশ গ্রহণ করিবার অবস্থা আমার নহে। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ঝরণার সুশীতল জল অঞ্জলি অঞ্জলি লইয়া মুখে চোখে দিয়া, মাথায় থাবড়াইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রমক্লান্ত দেহকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া প্রাণে স্বস্তি পাইলাম। একে পূর্ব্বরাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর প্রাতঃকাল হইতেই এই অনভ্যস্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম, প্রথম রৌদ্র সেবন—আমার শরীর মন একেবারে জখম হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য কিছু খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। সেই আমাদেরই জন্য আনীত দ্রব্যসম্ভার হইতে স্বল্পমাত্র দুগ্ধ 'চাহিয়া পান করিলাম। অবসন্ন দেহে সদ্য সদ্য যেন বলসঞ্চার হইল! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমরা দ্বি-তৃতীয়াংশের বেশী পথ অতিক্রম করিয়াছি, আর অল্পই বাকী। জয় সিদ্ধনাথজীউ! তবে দর্শন পাইব! সঙ্গী সহচরেরাও দুগ্ধাদি কিছু কিছু উদরস্থ করিয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তর মুটিয়াদিগকে বিদায় করিয়া আমরা নবীন উৎসাহে আবার রওয়ানা হইলাম; সঙ্গের ভদ্রলোকটি আমাদের সাথী হইলেন। শরীরও কিছু স্নিগ্ধ হইয়াছে, পথও আর অধিক বাকী নাই। দেবতার আসনের সন্নিহিত হইয়া আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, আমাদের বেহারবাসী সহচরদ্বয় আমাদের সমান ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। একে ত তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা মজবুত, তার উপর তাঁহারা এ সব পথে গতায়াতে অভ্যস্ত। আমার সঙ্গীটিও বোধ হয় আমার সমান ক্লিষ্ট হন নাই; তাঁহার বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাতে আবার দৌড়ধাপে তিনি পরিপক্ক। টিকাইতে টিকাইতে ক্রমে এমন এক স্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখান হইতে পর্ব্বত শিখরস্থ দেব মন্দিরটি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাসিত হইল—যেন অল্পই উপরে—অতি নিকটে! কিন্তু সোজাসুজি পথ ত নাই। আরও খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া চক্র দিয়া মন্দির-সীমানার সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া গেল।

কয়েকটি খণ্ড পাথরের ধাপ উঠিয়া আমরা মন্দির সীমার বাহিরে জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিলাম। প্রবেশ পথে আবার একটু বসিয়া লইলাম। দশ বারোজন লোক—বোধ হয় মন্দিরের পাণ্ডা পুরোহিতই হইবে—যাত্রী কেহই নাই—আমাদের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখিয়াই আমি চাহিলাম জল, পানীয় জল, আমার কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল। বেশ ভাল লোক তাহারা—পিতলের একটি গেলাস পূর্ণ করিয়া পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। আমি আলগোছে পান করিতে অভ্যস্ত নহি, গেলাসটি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি—নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণ নহে মুখ ফুটিয়া বলিল, "বাবু, আপনি মুখ ডুবাইয়া পান করুন, আমি গেলাস মাজিয়া লইব।"

আঃ বাঁচিয়া গেলাম। আশা মিটাইয়া পান করিলাম—ওঃ কি তৃপ্ত! শুনিলাম ইহা গঙ্গাজল। কোন্ গঙ্গা? একটুক্ষণ মন্দিরের সিঁড়ির পাশে বসিয়া জিরাইয়া লইয়া আমরা দেবদর্শনে অগ্রসর হইলাম। দ্বার পাশে সিন্দুরের ডালা বিক্রয় হইতে ছিল, আমি একটি গ্রহণ করিলাম। মন্দির-চত্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমার গলদেশে মাল্য অর্পিত হইল; আমি ডালা হাতে দেবমূর্ত্তির সমীপস্থ হইলাম। শ্রীশ্রী৺সিদ্ধনাথ বা সিদ্ধেশ্বর মহাদেব লিঙ্গমূর্ত্তি, অধিকাংশ দেহ প্রোথিত, অল্পই জাগিয়া আছে। দেবদেহের উপর ডালা স্থাপন করিয়া আদেশমত আমি স্পর্শ করিলাম; স্পর্শ করিয়াই রহিলাম, একজন ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় মন্ত্র পড়াইলেন, সে পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল উদ্ধার মন্ত্র। কি আর করি—যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি।

প্রণামী দক্ষিণা যাহা দিবার তাহা দেবদেহের উপর রাখিয়া দিতে আদিষ্ট হইলাম; তাহাই করিলাম। যিনি মন্ত্র পড়াইলেন, তিনি হাত পাতিয়া বলিলেন, "আমার?"

আমি শিব-শিবঙ্কিত মুদ্রা দেখাইয়া দিলে তিনি কহিলেন, "উহা অপরের প্রাপ্য।"

পাণ্ডা, যিনি ঠাকুরের অধিকারী অর্থাৎ যিনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্যগণ্ডা আলাহিদা, আর পুরোহিত অর্থাৎ যিনি মন্ত্রপাঠ করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রাপ্যগণ্ডা আলাহিদা।

শুনিয়াছি, ঠাকুর ইদানী এই পাহাড়ের কোন সন্ন্যাসীর সম্পত্তি। বেশ। পুরোহিতটির হস্তেও কিঞ্চিৎ দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হওয়া গেল। ছোট মন্দির, ছোট দুই তিনটি কুঠরী, নাতি বৃহৎ প্রাঙ্গন। শিখর হইতে সম্মুখের দৃশ্য কি সৌম্য শান্ত। পাদপ সমাচ্ছাদিত শৈলাঙ্গ অবিন্যস্ত স্তরে নামিয়া গিয়াছে। কতদূর। দূরে দূরে বিশাল প্রান্তর— যেন একখানি ছবি। সেখানকার অপরাপর দেবদেবীও দর্শন করিলাম। অবশ্য সর্ব্বত্রই দর্শনী দিতে হয়। সকল মূর্ত্তিই কাল পাথরের। একটী মূর্ত্তি দেখিলাম সিংহবাহিনী। কোন কোনটী বোধ হইল যেন বৌদ্ধমূর্ত্তি, হিন্দু নাম দেওয়া হইয়াছে। গয়া কিংবা তৎসন্নিহিত স্থান সকলে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ বৌদ্ধমূর্ত্তির রূপান্তর নামান্তর দৃশ্য হয়। এমন কি পুরুষ মূর্ত্তিকে স্ত্রীদেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সমগ্র মগধ যে ভগবান বুদ্ধদেবেরই বিহারভূমি -লীলাক্ষেত্র। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু স্থলে বহু বৌদ্ধধর্ম্ম সংসৃষ্ট মূর্ত্তি হিন্দু দেবদেবীর নাম ও সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। যাহা হউক আমার অভিষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। যে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া আসিয়াছি, সিদ্ধনাথজীর কৃপায় সে কামনা পূর্ণ হইল। মন্দির সীমানার মধ্যবর্ত্তী সকল দেবদেবীর চরণে প্রণামী অর্পন করিয়া মনে ভাবিয়াছিলাম, এখানকার কায শেষ হইয়াছে। সীমানা ত্যাগ

করিবাব উপক্রম করিতেছি, এমন সময় সেখানকার সেই লোকগুলি—মোট ১০।১২ জনের অধিক হইবে না,—ইহার বেশী লোক ঐ দুর্গম পাহাড়ে বোধ হয় থাকেই না, তাহারা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, স্মিত বিনয় বাক্যে বলিল—"কৈ, ব্রাহ্মণভোজনের নিমিত্ত কিছু এখনও দেওয়া হয় নাই ?" তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তবে আমরা অব্যাহতি পাইলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, উঠিবার সময় মন্দিরের কাছ বরাবর পথে গোটাকতক পাথর নির্ম্মিত উনুন বা তুতুল, ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী টুকরা, হোগলা ছাইবার শুষ্ক ঘাস পাতা কিছু কিছু ছড়াছড়ি দেখিয়াছিলাম। শুনা গেল, ভাদ্রমাসে এ পাহাড় অঞ্চলে এক মেলা হইয়া থাকে, সে সময়ে অনেক যাত্রী সিদ্ধনাথজী দর্শনে আইসে, তাঁহাদের জন্য পথে দোকানপাট বসে, চালা বাঁধা হয়। সম্ভবতঃ এ সকল তাহার নিদর্শন।

এইবার আমাদের নামিবার পালা। দেবালয়ে উঠিবার এবং নামিবার পথ 'কিস্তি' পর্য্যন্ত একই, পবে ভিন্ন পথ ধরিয়া নামা যায়। পাহাড়ে উঠা অপেক্ষা নামা সহজ, সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের নিকট সেদিন তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। ঘর মুখো জন্তুর মত তড়্ বড়্ তড়্ বড়্ করিয়া খানিকটা পথ সহজে নামা গেল; বেশ সহজে নয়, কাবণ বন্ধুর সঙ্কীর্ণ পথ, মধ্যে মধ্যে দুধারে কাঁটাগাছ, তার উপর উৎরাই বড় বেশী। নামিতে নামিতে খানিকটা বা পুনরায় উপর দিকে উঠিতে হয়, কতক উপরে গিয়া, আবার অপর দিক দিয়া কিছু ঢালু রাস্তায় চলিতে হয়। সেখান হইতে কতকটা ধাপে ধাপে নামিতে হয়। মনে করিবেন না যেন ধাপ বা সিঁড়ি আছে। চলিতে চলিতে পথ এমন হইয়া আসিল যে খানিকটা লম্ফ দিয়া কিম্বা বসিয়া বসিয়া ফুট দুই তিন নামিতে হইল। এই প্রকার অনেকবার। নামিতে নামিতে যে এমন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়, আগে জানিতাম না। গলদঘর্ম্ম হইয়া আমি ত গায়ের মোটা জামা চাদর খুলিয়া ফেলিলাম, গোমস্তা

বাবুর সহচরটি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেগুলি বহন করিতে লাগিলেন। আর পারি না, এক যায়গায় বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—"রও একটু দম লই।" মনে হইতে লাগিল, আজকার মত এখানে রহিয়া যাই। বেশ ঝরঝরে বাতাস বহিতেছিল এত মিঠা লাগিতেছিল যে নড়িতে মন সরে না। আমি 'গট' হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া সঙ্গী বলিলেন—"আপনি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, নগাধিরাজ হিমালয়ে ওঠানামা করিয়াছেন, এ ক্ষুদ্র পর্ব্বতে এ কি ভাব?"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আমি উত্তর করিলাম, "সে পথ আর এ পথ!"

তিনি বলিলেন, "আপনি এমন কাতর হইতেছেন, কিন্তু আমার ত নামিতে আমোদ বোধ হইতেছে। কষ্ট আছে, কিন্তু কষ্টের মধ্যেও একটু অভিনবত্বের সুখ উপভোগ করা যাইতেছে না কি?"

কথা শুনিয়া লজ্জা পাইলাম। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, কাঁটাগাছের আঁচড় খাইতে খাইতে, কোথাও কোথাও বসিয়া বসিয়া নামিতে, ক্রমে আমরা এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যেখানটা বেশ ফাঁকা; সম্মুখের দৃশ্য চিত্তমুগ্ধকর। অত কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু স্বভাবের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষলতায় সমাচ্ছাদিত গিরিমালায় স্তরে স্তরে কি শোভা! আমাদের সম্মুখে নীচের উপত্যকা দূরে দূরে দেখা যাইতেছে—চিত্র বিচিত্র! গোমস্তাবাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন, ঐ নীচে সাতঘরা, ঐ গুহা—ঐ গুহার দ্বার। আমরা নূতন লোক, বিশেষ কিছু মালুম করিতে পারিলাম না, কিন্তু শুনিয়া আনন্দ হইল। দূর হইতে মনে হইল, নিম্নে—বহুনিম্নে—বিশাল উপত্যকার অপর পারে যেন গাছপালার মধ্য হইতে কোন একটা বিবরের মুখ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সে এখন অনেক দূরে—অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া নামিয়া সেখানে পৌছাইতে হইবে। আমরা অতি সন্তর্পনে পা ফেলিয়া ধীরে

ধারে নামিতে লাগিলাম। ক্রমে নামিবার পথ এমন হইয়া আসিল যে আর জুতা পায়ে নামা চলিল না; প্রতি পদক্ষেপে পা হড়্কাইয়া যাইবার ভয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁই পাথরের গড়ানিয়া রাস্তা, গাছপালা মাটী নাই, প্লেন পাথরের উপর দিয়া চলিতে হয়। অনেক খানি পথ এমন ঢালু যে, একটু অন্যমনস্ক হইলেই পা পিছলাইয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গড়াইয়া যাইতে হইবে; কোথায় কোন খাদে গিয়া পড়িতে হইবে ঠিকানা নাই। জুতা খুলিয়া হাতে লইয়া, পা পা করিয়া, অতি সাবধানে নামিতে হইল। এখানে এই চাঁই পাথরের ঢালু ছাদে মানুষের পায়ের খাপে ছোট পাত্‌লা খাঁজ কাটা আছে—মধ্যস্থলে এক সারি মাত্র, কতক দূর পর্য্যন্ত। সেই খাজে খাজে পা রাখিয়া আমি ত নামিতে লাগিলাম। শুনিয়াছি, সাহেবরা প্রায় এখানে আছাড় খান, একবার একটি মেমসাহেব এই পথে নামিতে গিয়া, তাঁহার পা পিছলাইয়া গিয়াছিল, তিনি ডিগবাজি খাইতে খাইতে বহুদূর গড়াইয়া যান, যথেষ্ট চোট লাগিয়াছিল, সহযাত্রী একজনের ঘাড়ে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার পতনের গতি রোধ হয়; নতুবা আরও বেশী দূর পর্য্যন্ত গড়াইতে থাকিলে, তাঁহার অস্থিপঞ্জর ছাতু হইয়া যাইত।

যাহা হউক, ঠাকুর সিদ্ধনাথের করুণায় আমরা প্রাণ বাঁচাইয়া কষ্টে সৃষ্টে কোনক্রমে নিম্নের উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-মালায় বেষ্টিত প্রকাণ্ড ময়দানের মত বরাবর পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ—অবশ্য সমতলভূমি নহে। এখানে পৌঁছিয়া আমরা আবার পায়ে জুতা মোজা চড়াইয়া সুস্থ হইলাম। এই সানুদেশেও নাতিপ্রশস্ত পথ কাটিয়া একটি পার্ব্বত্য ঝরণা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহিয়া যাইতেছে, আমরা লম্ফ দিয়া পার হইলাম। সেই ঝরণা ডিঙ্গাইয়া আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, সেই বিশাল ময়দানের এক পার্শ্বের সীমানা রূপে যে পাহাড় উঠিয়াছে, আমাদের অভিমুখে সেই পাহাড়ের গায়ে লতাগুল্মের মধ্যে একটি ছোট

চতুষ্কোণ দুয়ারের মত কি দেখা যাইতেছে। তখনও মনে হইতেছিল, কোন হিংস্র জন্তুর বিবরের মুখ। গোমস্তা বাবু সহাস্য বদনে প্রকাশ করিলেন,—"এতক্ষণে আমরা সাতঘরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি—সম্মুখেই সাতঘরার প্রথম ঘর।"

সাতঘরা বরাবর পাহাড়ের অংশ বিশেষ। সিদ্ধনাথ পাহাড়ও তাই। বরাবর একটি পাহাড় নয়, নানা নামের কয়টি পাহাড় লইয়া বরাবর শ্রেণী। নাগার্জ্জুনী নামে ইহার আর একটি অংশ আছে। বরাবর শ্রেণী গয়ার জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত। ইহার অপর পার্শ্ব দিয়া ফল্গু বা নৈরঞ্জনা নদী পাদমূল ধৌত করিতে করিতে ভুজঙ্গ-গতির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। আমরা পথে যে সকল ঝরণার উল্লেখ করিয়াছি, বোধ হয় সেগুলি নামিয়া গিয়া ফল্গুর কলেবর পুষ্ট করিতেছে! কতক বা নিকটবর্ত্তী পুনপুন্ তটিনীতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে।

আমরা যখন সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ঢালু প্রস্তর পথে নামিতেছিলাম, সেখান হইতে এখানকার এই উপত্যকা দেখা যাইতেছিল। আমার সঙ্গীটি নীচের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন –"আঃ বাঁচা গেল। এখন মনে হইতেছে, আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইতে পাইব; কারণ আমাদের সুদীর্ঘ পথ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে ময়দানে ঐ আমাদের হাতীটি রহিয়াছে দেখা যাইতেছে! দেখুন, দেখুন, দেখিতে পাইতেছেন না?" আমি বাস্তবিকই দেখিতে পাই নাই, তবু খবর শুনিয়া মনে ভরসা আসিয়াছিল। এই উপত্যকার স্থানে স্থানে কালো পাথরের স্বাভাবিক স্তূপ রহিয়াছে, আমরা দেখিতে দেখিতে যাইতেছি; সঙ্গী হাসিতে হাসিতে আপনিই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, "আমি উপর হইতে আপনাকে যে আমাদের হাতী দেখিতে পাইতেছি বলিয়াছিলাম, এখন

বুঝিতে পারিতেছি, সেটি হাতী নয়, এই স্তূপগুলির কোনটা হইবে। রঙ ত একই বটে; দূর হইতে হস্তী আকার মনে হইয়াছিল, কাছে আসিয়া দেখিতেছি ঠিক তা নয় এবং এগুলি অনেক বড়।” শুনিয়া সকলেরই মুখে হাসি আসিল। এতক্ষণ পরে আমার মুখে হাসি দেখা দিল। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, ফুল নম্বর না পাও, ফাষ্ট ডিভিজনে পাশের নম্বর থাকিবে; বেশী ভুল কর নাই, একটা আকারের মাত্র—‘নগ’ আর ‘নাগ।’ গোমস্তা বাবু হাসিয়া বলিলেন,—এ স্থানে হাতী পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ উঠিবার রাস্তা নাই। হাতী এখনও অনেক নীচে আছে।

ঔৎসুক্যভাবে আমরা সাতঘরার সমীপস্থ হইলাম। দ্বারপথে ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে দেখিলাম, দুয়ারের উভয় পার্শ্বের দেওয়াল চক্‌চকে ঘোরঘোর ছাইরঙা মার্ব্বেলের মত পালিস করা পাথর। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি বৃহৎ কক্ষ, তাহার সমস্ত দেওয়াল খিলান ছাদ আগাগোড়া ঐরূপ সুন্দর চিক্কণ মসৃণ পালিস করা পাথর। অবধান করিবেন, পাহাড়ের গা কুঁদিয়া গুহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পর ভিতরটা সমস্ত সুমার্জ্জিত ও পালিশ করা হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসরের অধিক পূর্ব্বেকার গঠন এখন পর্য্যন্ত এমন সুন্দর রহিয়াছে যে তাহাতে মুখ দেখা যায় বলিলেও চলে। হোয়াইটওয়ে লেডল কোম্পানী কিম্বা আর্ম্মি নেভি-ষ্টোর্সের কলিকাতা মোকামের সম্মুখস্থ থাম যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা আঁচ পাইবেন। অবশ্য বিবিধ রং নাই।

আমরা প্রথম যে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার নাম ‘কর্ণঝোপরা’। গুহাটির দ্বারপথের দেওয়ালে বাহিরে দ্বারের শিরোভাগে, আমাদের অজ্ঞাত ভাষায় কয়েক লাইন কি সব অক্ষর খোদিত রহিয়াছে। গোমস্তা বাবু বলিলেন, কি ভাষা কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরে

জানিতে পারিয়াছি,—মৌর্য্য সম্রাট অশোকের স্তম্ভগাত্রে যে ভাষা দৃষ্ট হয়, ইহাও সেই ভাষা। এই অক্ষর গুলির লিপিবদ্ধ আছে যে—মহারাজ প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে (খৃঃ পূঃ ২৫৫) এই গুহা খোদিত হইয়াছে। দ্বারপথের দেওয়ালে বোধ হয় নির্ম্মাতা বৌদ্ধগণের প্রদত্ত গুহাটির আসল নাম খোদিত রহিয়াছে—'বোধিমূল', 'দরিদ্রকান্তার' প্রভৃতি। কোন অবিবেচক দর্শক কিংবা বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড কর্ত্তৃক এক আধ স্থানে তীক্ষ্ণ বাটালির আঘাত আছে মনে হয়। গুহাটির দ্বার উত্তরমুখ; ভিতরে আলো বাতাস প্রবেশ করিবার অন্য কোন পথ নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট ৬॥ ইঞ্চি, প্রস্থ ১৪ ফুট, দেওয়ালের খাড়াই ৬ ফুট ১॥ ইঞ্চি, তাহার উপর খিলানের উচ্চতা ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি, সুতরাং গুহাটি উচ্চে ১০ ফুট ৯॥ ইঞ্চি। ইহার পশ্চিম দিককার দেওয়ালে মেঝে হইতে হাত খানেক উঁচু, হাত পাঁচেক লম্বা, হাত দুই চওড়া খানিকটা নিরেট রোয়াকের মত আছে। অনেকের বিশ্বাস, ইহা বুদ্ধমূর্ত্তি অধিষ্ঠানের বেদী বা উচ্চাসন—আপাততঃ শূন্য। আমরা কিয়ৎকাল তাহার উপর বসিয়া লইলাম, পা জুড়াইল। বার কতক গুহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মেঘমন্দ্রগম্ভীর প্রতিধ্বনি শুনিয়া লওয়া গেল। গোমস্তা বাবুর 'ব্যোম ব্যোম মহাদেও' শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া বড় চমৎকার শুনাইয়াছিল। আমরা বেলা ৩টা-৩॥টার সময় ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, সেই কারণে বিনা প্রদীপেও ভিতরকার সমস্ত দেখিতে পাইয়াছি; সে সময়েও ভিতরটা আধা আলো।

দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া অনবরত তৃষ্ণা পাইতে লাগিল, উদর মধ্যে জল ধরিবার স্থান আর নাই, তবু কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া তৃষ্ণায় প্রাণ টা টা করিতে লাগিল। সঙ্গী মনে পড়াইয়া দিলেন, কিঞ্চিৎ অম্লরস সেবনে সহজে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। এতক্ষণ পরে খেয়াল হইল, পকেটে কমলা

লেবু রহিয়াছে। ভাগ্যিস ছিল। তাহাই বাহির করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করা গেল। অবশ্য সঙ্গীটিও ভাগ পাইলেন।

কর্ণঝোপরা হইতে বাহির হইয়া আমরা সেই শৈলাঙ্গ অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ করিয়া বিপরীত দিকে উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, ঠিক পূর্ব্বের মতই একটি দ্বার রহিয়াছে, সেটি দক্ষিণ মুখ, তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬॥ ফুট, দল ২ ফুট। দ্বারের উপরিভাগে বাহির দেওয়ালে সেই প্রকার কয় পংক্তি অক্ষর খোদিত আছে, তাহার অর্থ, রাজাধিরাজ প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে এই গুহা নির্ম্মিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, মেঝেতে ছিন্ন চেটাই, শুষ্ক পাতা, ঘাস প্রভৃতি গড়াগড়ি যাইতেছে, স্পষ্ট মনুষ্যবাসের চিহ্ন। হইতে পারে, ভাদ্রপদে এই পাহাড়ে যে মেলা বসে—কেহ কেহ বলেন তাহার নাম 'আনন্দ পূজা' (অনন্ত চতুর্দ্দশী ?) সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী এবং দূর গ্রামের বিস্তর লোক এই সকল স্থানে আসিয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসী গোছের কেহ কেহ হয়ত এই গুহাকে আশ্রম করিয়াছিল, তাহাদেরই পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি পচিয়া শুকাইয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ষাকালে এই সকল গুহায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়, বর্ষান্তে ক্রমশঃ ঝরিয়া যায়, শোষিত হইয়া যায়। গুহার অভ্যন্তরে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখি, পশ্চিমের দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের মত পথ রহিয়াছে—তাহার ভিতরটা ঘোর অন্ধকার। দীপশলাকা সাহায্যে দেখা গেল, ভিতরে একটি গোলাকার ছোট কুঠরী - অতি অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময়। জনরব, ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র সিংহাদী হিংস্র পশু ও শৃগাল আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য্য নহে, জনমানবহীন জঙ্গলময় স্থান। কোন গ্রন্থে এক সময়ে পড়িয়াছিলাম,—বরাবর পাহাড়ে পূর্ব্বকালে সিংহ বাস করিত। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, এই গর্ভগৃহ বা ভিতর কুঠরীর মধ্যে মনুষ্য শরীরের সমগ্র অস্থিমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তদ্বারা প্রমাণ হয়, গুহাভ্যন্তরে কেহ কেহ দেহ রক্ষা করিয়াছেন; মোক্ষ্যকামী সাধু সন্ন্যাসীও হইতে পারেন (গোঁড়া হিন্দু লোকের তাহাই বিশ্বাস), অনাহারক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষের আসামীও হইতে পারে, কিংম্বা রাজ দণ্ড ভয়ে লুক্কায়িত অপরাধীও হইতে পারে, অথবা হিংস্র পশু আনীত শিকারের দেহাবশেষ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কে জানে কাহার অস্থি? এই দ্বিতীয় গুম্ফা বা গুহাটির নাম—'সুদাম গুহা'—আয়তনে এটি (ভিতর কুঠরী বাদ) প্রায় প্রথমটির মত। দৈর্ঘ্যে ৩২ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি, খিলানের উচ্চতা ১২ ফুট ৩ ইঞ্চি। গর্ভগৃহটি আয়তনে কম কিন্তু উচ্চতায় অধিক। ইহার ব্যাস ১৯ ফুট ১১ ইঞ্চি, খাড়াই ১৯ ফুট। খিলানের পাথর আগাগোড় পালিষ করা নয়, মনে হয়, কাষ করিতে করিতে যেন বাধা পড়িয়াছে, সেই হেতু অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কক্ষের খিলানে ঘাট্ ফাটলের মত দৃষ্ট হয়।

তাহার পর তৃতীয় গুহা, নাম 'লোমস ঋষি' গুহা। এই নামীয় কোন ঋষির আশ্রম ছিল সম্ভব, অবশ্য পৌরাণিক কেহ নহেন। এটি পূর্ব্বোক্ত সুদাম গুহারই অনুরূপ, আয়তনে প্রায় সমান। ইহার অভ্যন্তরেও গোলাকার ছোট কুঠরী আছে, কিন্তু এই কুঠরীর খিলান মোটে পালিষ করা নয়। গুহা বা কক্ষের মেঝে এবং ছাদ অর্থাৎ খিলান যেন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার পর চতুর্থ গুহা,- নাম 'বিশ্বামিত্র' গুহা বা 'বিশ্বঝোপরা' এটি অপেক্ষাকৃত ছোট গুম্ফা। ইহাও অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন; গোল অভ্যন্তর কুঠরী বা গর্ভগৃহ আছে—বন্ধুর প্রস্তরে নির্ম্মিত, মোটেই মার্জ্জিত নহে, অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত। কক্ষটির দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। গর্ভগৃহের ব্যাস ১১ ফুট।

এ সকল বৌদ্ধশ্রমণগণের মঠ, গুহাগুলি বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শন হইলেও

তাহাদের নাম হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পবে প্রদত্ত, সন্দেহ নাই। এই কয়টি গুহা দেখিয়াই আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। চবণ আর চলিতে চাহিল না। বিশেষতঃ সে সময়ে আবার উপব হইতে দেখা গেল, দূবে নীচে আমাদেব বাহন হাতিটি, খেলানাব ছোট একটি হাতীব মত, শুড় নাড়িতে নাড়িতে মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছে। এবার আব দৃষ্টিবিভ্রম নয়। তখন মন আর বাগ মানিল না, আর শ্রমস্বীকাব কবিতে প্রবৃত্ত হইল না। গোমস্তা বাবু এবং তাহার সহচরও বলিলেন—"আর কাজ নাই বাবুজী, আপনাদের এত কষ্ট করা অভ্যাস নাই দেখিতেছি, বিলক্ষণ হাঁফাইয়া পড়িয়াছেন। এখন চলুন পাতালগঙ্গায় ঠাণ্ডা হইয়া হাতী চড়িবেন।"

পাতালগঙ্গা! একি নাম? ভোগবতী না কি! এই গঙ্গাবই বিমল বারি সিদ্ধনাথ মন্দিরে পান করিতে পাইয়াছিলাম বটে? সম্ভব। মনে করিয়াছিলাম, অন্ধকার পর্ব্বতগুহার মধ্যে ধাবমানা কোন ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হইবে। কিছুদূর ঘুরিয়া ফিরিয়া পার্ব্বত্যপথ ছাড়িয়া নামিয়া আসিয়া দেখিলাম—দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গেল। তিন দিকে পর্ব্বত মালা বেষ্টিত একটি দিব্য পুষ্করিণী, আকারে চতুষ্কোণ পার্ব্বত্য হ্রদ। একদিক হইতে একটি জলপ্রপাত উচ্চ ঊর্দ্ধ হইতে ঝম্‌ঝম্ করিয়া তাহার উপর পড়িতেছে, যেন পুষ্পরাশি জলময় ছড়াইয়া যাইতেছে! পরিষ্কার জল, কিনারায় ছোট ছোট মৎস্য-শিশুগুলি কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে—আমাদের হাতে পায়ের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এস্থানে মৎস সংহার নিষিদ্ধ; বৌদ্ধ এলাকা—মনে রাখিতে হইবে। শুনিয়াছি "পাহাড়ে পূর্ব্বকথিত মেলার সময় ৩০।৩৫০০০ (নরনারী) যাত্রী নাকি এখানে আইসে এবং এই পাতালগঙ্গার পূত বারী স্পর্শ করিয়া পাপক্ষয় করে। সেই জলে হাঁটু পর্য্যন্ত নামিয়া, হাতে লইয়া মাথায় থাবড়াইয়া, অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল। পাপক্ষয় হইল কি না জানিনা, শ্রান্তি-

ক্লান্তি অনেক পরিমাণে সদ্য সদ্য অপনোদিত হইল। শরীরের গ্লানি, মনের অবসাদ কোথায় চলিয়া গেল। হ্রদটির এক কোণ দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া যাইতেছে, জুলিকাটা পথ। আমাদের হাতিটি সেই নালার জল পান করিতে লাগিল, শুঁড় দিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইতে লাগিল। তাহারও ভারি আমোদ, সেও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। একটু অতিরিক্ত রূপেই পূর্ণ হইয়াছে; কারণ আমরা দেখিতে আসিয়াছিলাম—পালিষ করা পাথরের গুহা গুলি মাত্র; সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া গেল। সিদ্ধনাথ মহাদেবের পূজা দেওয়া হইল, পাতালগঙ্গার পূত বারি স্পর্শে পাপ ক্ষালন করা হইল! কিন্তু মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ আক্ষেপও রহিয়া গেল। (১) আমরা এই পর্ব্বতমালায় কোথাও কোন সাধুসন্ন্যাসীর দর্শনলাভে বঞ্চিত রহিলাম, পথে কোনস্থানে সাধুসন্ন্যাসী বা তাঁহাদের আস্তানার কোন চিহ্ন লক্ষিত করিতে পারি নাই। গুহার অভ্যন্তরের কথা ছাড়িয়া দিই, কারণ সেখানে কিসের নিদর্শন রহিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। (২) আমাদের ক্ষোভের দ্বিতীয় হেতু,—অতি শ্রান্তিবশতঃ পার্শ্বস্থ নাগার্জ্জুনী পাহাড়ে আমাদের যাওয়া হইয়া উঠে নাই। নাগার্জ্জুনী বরাবর পর্ব্বত-মণ্ডলীরই অংশ, এখানেও তিনটি গুহা আছে। সেগুলি মহারাজাধিরাজ অশোকের পৌত্র দশরথের আদেশে নির্ম্মিত। নাম—'গোপী কা কুভা' 'বাপিয়া কা কুভা', 'বধাতি (বধার্থী), বা কুভা।'

শুনিয়াছি, বরাবর পাহাড়ের গুহাগুলিতে এমন সব অক্ষরও খোদিত আছে, যাহা উহাতে বুঝা যায় যে এ গুলি বৌদ্ধসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইলেও, পরে এক সময়ে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইয়াং চুয়াং যে সময়ে এদেশে শুভাগমন করেন, সে সময় (খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে)

এই সকল গুহা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ বোজনামচায এ সকলের কোনও উল্লেখ করেন নাই –অথবা হইতে পারে ঐ কারণ বশতঃ তিনি এ অঞ্চলে পদার্পণই করেন নাই। আমাদের মহাকবি নবীনচন্দ্র মত প্রকাশ করিয়াছেন—"বিদেশীয় বৌদ্ধেরা বুদ্ধগয়া লইয়া তোলপাড় করিতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি শ্রমণ এই বরাবর তীর্থে পাঠাইয়া ইহার পুনর্জীবন প্রদান করিয়া সমস্ত মানব জাতির জন্য একটী স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।" বলা বাহুল্য, এই শৈলকক্ষ সকল শূন্য পড়িয়া আছে। আমরা কৌয়াডোলের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্থানীয় ভূস্বামিগণের অধিকার।

নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতের গুহাগুলি আরও পরবর্ত্তীকালে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, গোপীগুহার বাহিরে এক ফকিরের দরগা বিদ্যমান, মুসলমানের গোরস্থান সন্নিকটে, কোন গুহা ইদানীং পর্য্যন্ত মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি অগ্রে বেহার জয় করেন। (এই সময়েই অতুল্য ওদন্তপুর গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয়)। তৎপরে বঙ্গদেশ অধিকারে অগ্রসর হন।

আমরা পূর্ব্বে চারি গুহার উল্লেখ করিয়াছি, বলিয়াছি তাহার তিনটীর এক একটি করিয়া ছোট কুঠরী বা চক্রাকার গর্ভগৃহ আছে, সেগুলি পৃথক ধরিলে সাতটি ঘর বা গুহা হয়, অনেকের মতে এই সাতটি ধরিয়াই নাম সাতঘরা। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, গর্ভগৃহ যে যে গুহায় আছে, সেগুলি সেই সেই গুহারই অংশ, পৃথক নহে। অতএব বরাবর পাহাড়ে আছে চারিটি গুহা, আর নাগার্জ্জুনী পাহাড়ে আছে তিনটি গুহা, উভয় পাহাড় ধরিয়া 'সাতঘরা।' যাহাই হউক সাতঘরা আমাদের দেখা হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ এই গুহাগুলির সহিত মহাভারতের মগধরাজ

জরাসন্ধের নাম জড়িত করে। সে সকল বলিবার এখন আমাদের সময় নাই। মগধে অনেক বৌদ্ধকীর্তি "জরাসন্ধকা বৈঠক্" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর বিলম্ব করা চলে না। গোমস্তা বাবুর নিকট হইতে আমরা সাদর বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি সদাশয় লোক—বিশ হাজারের তহবীল তাঁহার হাতে—তিনি কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অনুচরের হস্তে পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু গুঁজিয়া দিয়া, আমরা আবার সেই খুনে জানোয়ারটির আরোহী হইতে অগ্রসর হইলাম। কবীরর গদাইলস্করী চালে নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমরা দুই সঙ্গী পূর্ব্বেকার মত যেন-তেন প্রকারে চড়িয়া বসিলাম। পথ প্রদর্শকদ্বয় পাহাড় পথে পথে স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হাতীর খোরাক কিনিবার জন্য মাহুতকে কিছু দিয়া গিয়াছিলাম, মাহুত এবার বলিল, খাইয়া দাইয়া গজরাজ এখন বেশ খোসমেজাজে আছে। শুনিয়া নিশ্চয়ই আমরা যথেষ্ট নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। আসিবার সময় যে বিভীষিকা প্রাণটি ত হাতে করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, আবার আমরা সেই কোয়াড়োল, ক্ষেত, জঙ্গল, ডোবা, নালা পার হইয়া, খানিক বিভিন্ন পথ ধরিয়া, কোন গতিকে লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে বেলা ষ্টেশনে পৌছান গেল। নামিবার পূর্ব্বে মাহুতকে কিছু বখ্‌শিস দিলাম বুড়া ভারি খুসী। এমন ভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিল, যাহাতে বুঝা গেল বেচারা সকল সময় পুরস্কারাদি পায় না, বেগার খাটিয়া মরে। হাতী হইতে অবতরণ করিবার সময় হাত হইতে অবলম্বন রজ্জু ফস্‌কাইয়া গিয়াছিল, বেশ একটি আছাড় খাইলাম। দড়ী ফস্‌কাইবার কারণ, অজ্ঞানতঃ হাতীর লোমযুক্ত স্থানে হাত লাগিয়াছিল, কে জানে হাতীর লোম। আলপিনের মত ফোটে, প্যাট করিয়া বিঁধিয়া যাইবামাত্র তাড়াতাড়ি হাত সরাইতে গিয়া,

হাত হইতে দড়ি খসিয়া গেল, তখনি ধড়াস্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলাম। ভাগ্য ভাল যে হাতী তখন উপবিষ্ট। মাহুত আমাদেব সবিয়া যাইবাব জন্য তাড়া দিতেছিল। পড়ি কি মরি, আমি ত উঠিয়া ছুট; আব মূহূর্ত্তমাত্র দেরী হইলেই উঠন্ত হাতীব পা পিছাইয়া আমাব উপব পড়িত। তাহা হইলে—

ষ্টেশনে আসিতেই ষ্টেসনমাষ্টাব বাবু যত্ন করিয়া এক বাল্‌তি পবিষ্কাব জল ও একটি লোটা আনাইয়া দিলেন; আহাবাদির বন্দোবস্ত কবিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদেব বসদ ত হ্যাণ্ডব্যাগে বিস্কুটেব বাক্সে ছিল। বেশ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া গামছা ভিজাইয়া গা মাথা মুছিয়া শবীব স্নিগ্ধ হইল। তখন আমবা বাতি জ্বালিলাম, ওয়েটিং রুম অন্ধকাব। ক্রমে সেই বাসি মিষ্টান্নের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হওয়া গেল—অমৃত মনে হইতে লাগিল। গয়াগামী ট্রেণ বাত্রি ১১॥ টায়; এখন ৫/৫॥ ঘণ্টা চুপচাপ বসিয়া গোঙাইতে হইবে। কবি নই যে কবিতা লিখিতে বসিব; সঙ্গে কেউ গাহিয়ে বাজিয়ে নাই যে 'তা না নানা' করিয়া সময় কাটাইব; অগত্যা ওয়েটিংরুমে টেবিলেব উপব বগ, বালিশ বিছাইয়া 'শয়নে পদ্মলাভ' করা গেল। শুইয়া শুইয়া সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "কিহে কবিতা-টবিতা আসে?" অতর্কিত ভাবে ঝাঁ করিয়া তিনি বলিয়া বসিলেন, "হাঁ, কাগজ পেন্সিল লইয়া বসুন।" উত্তর শুনিয়া আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম; ভাবিলাম হবেও বা,—কবি Gray র "Full many a flower is born to blush unseen" কথাটাব সার্থকতা বহুস্থলে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কাগজ পেন্সিল বাহিব করিয়া বলিলাম—"সুরু কর।" তিনি ঈষৎ কাসিয়া গম্ভীর ভাবে আবম্ভ করিলেন—

"পান্থ আমি ক্লান্ত আমি পরিশ্রান্ত হে . .. . . ."

একটা লাইন লিখিয়াই আমি কাগজ পেন্সিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, ধম্‌কাইয়া উঠিলাম—"তামাসা? অত বড় কবিকে ভ্যাঙচান হইতেছে?" উত্তর হইল,—"আপনার শপথ, এ আমার তাপ দগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।" আমি শুনিতে শুনিতে বলিলাম—"ঢের হইয়াছে, আর বিদ্যা প্রকাশে কাজ নাই, ঘুমাও।"

তন্দ্রা আসে আসে হইয়াছে; টের পাইতেছি একটি ছোট নেংটি ইন্দুর খুর খুর্ করিয়া আসিয়া খাবারের গুঁড়া গুলি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, অসময়ে মনুষ্য সমাগম দেখিয়া খুট্ খুট শব্দে পলাইতেছে; আবার টিপি টিপি আসিতেছে। শুনিতে পাইতেছি, সঙ্গীটি অস্ফুট স্বরে কি শ্লোক আওড়াইতেছেন। আমি থিয়েটারী ঢঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, লাউডার! কিঞ্চিৎ লাউডার হইলে শুনিতে পাইলাম—

"কালো কোলো অবয়ব এত্ত বড় শুঁড়।
চেহারা দেখিলে বুক করে গুড়্ গুড়্॥"

আমার তন্দ্রা টুটিয়া গেল; হাসিয়া বলিলাম—'বাঃ! সাক্ষাৎ গুপ্ত কবি, কিন্তু তোমার ঘর কি বুড়ীগঙ্গা পার? আমাদের কলিকাতার বঙ্গভাষায় এরূপ স্থলে গুড়্ গুড়্' বলে না, "গুর্ গুর্" বলে। আকাশে মেঘ গুড়্ গুড়্ করে, শুনিয়া লোকের বুক গুর্ গুর্ করিতে থাকে। সে যাহা হউক, কিন্তু তুমি যেরূপ বর্ণনা করিলে, সে কি এই জানোয়ারটির?" বলিয়া নাকের কাছে একটা উড়ন্ত ডাঁশ মশা দেখাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, "গণেশপ্রসাদের বর্ণনা করিতেছি, আপনি বলেন মশা!" আমি বলিলাম—"বাপু হে, চট কেন? হাতী আর মশা—বড় আর ছোট সাদৃশ্যটা সাংঘাতিক। একটা সত্য ঘটনা বলি শোন,—

"একদা এক আন্‌কোরা বিলাতী বিবি ভারতবর্ষ বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। প্রথমবার জাহাজ আসিয়া বোম্বাইয়ে লাগিল, আরোহীরা

যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিলেন, বিবিটিও শকট আরোহণে নির্দ্ধারিত হোটেলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কি তাঁহার নয়নগোচর হইল, দেখিয়াই তিনি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শকট-চালককে কহিলেন, 'ফিরাও, ফিরাও, সহরের ভিতর যাইব না, জাহাজে ফিরিয়া যাইব।' জাহাজে যখন ফিরিয়া আসিলেন, সকলেই বিস্মিত হইল। লোকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—'কি সর্ব্বনাশ, এমন দেশেও মানুষ থাকে। আমি কেতাবে পড়িয়াছি, ভারতবর্ষে এক প্রকার প্রাণী আছে—বালো কালো, শুঁড়ওয়ালা, তাহারা মনুষ্যের বুকের উপর চাপিয়া শুঁড় লাগাইয়া রক্ত শোষণ করে। সেই প্রাণী আজ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কি ভয়ানক! আর আমি এদেশে নামিতেছি না।" অনুসন্ধানে জানা গেল, সহরে কে রাজারাজড়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কয়টি হাতী ছিল, পথিমধ্যে মেম সাহেব সেগুলি দেখিতে পাইয়াছিলেন—কালো কালো, শুড়ওয়ালা। তিনি কেতাবে পড়িয়াছিলেন যে প্রাণীর কথা, সে মশা। তাই বলিতেছিলাম বাপু হে—সাদৃশ্য।"

সঙ্গী বাবু আর উচ্চবাচ্য না করিয়া গোঁফে তা দিতে লাগিলেন। আমি বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লইলাম। যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে ষ্টেশন মাষ্টার বাবু জাগাইয়া দিলেন, আমরা বরাবর-ভ্রমণ-বৃত্তান্তের জাবর কাটিতে কাটিতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।